শতবর্ষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব : সমাজতন্ত্রে নারী



সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম

শতবর্ষে রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব : সমাজতন্ত্রে নারী

শতবর্ষে রুশ
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব : সমাজতন্ত্রে নারী

প্রকাশক
সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৫৮২২০৬, ০১৭১৬ ৫৭৫২৭৭ ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২
ই-মেইল : swfcc.bd@gmail.com

প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০১৭
ঢাকা, বাংলাদেশ

প্রচ্ছদ
ছবি : জাহেদুল হক রনি
অলঙ্করণ : আব্দুর রাজ্জাক রুবেল

মুদ্রণে
গ্রন্থিক মিডিয়া এইড সার্ভিস
৮/৪-এ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
মোবাইল : ০১৬৭৬ ৩১৩৯৫৭, ই-মেইল : p.gronthik@gmail.com

মূল্য : ৫০ টাকা

ভূমিকা

৭ নভেম্বর ২০১৭ রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের একশ বছর পূর্তি। একশ বছর আগের পৃথিবীতে মানুষ দেখেছিল এমন এক দেশ যে দেশে 'মানুষ সবচেয়ে বড়'! যে মানবিক সাম্য সমাজের লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে মানব সভ্যতা তার বাস্তব রূপায়ণ ঘটেছিল এই ধরণীতে—সোভিয়েত রাশিয়ায়। তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাশিয়ার চিঠিতে লিখেছিলেন, 'রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকতো।' নারী সমাজের জন্য তা আরও বেশি সত্য।

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এবং তার পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের অভিযাত্রায় সোভিয়েত রাশিয়া নারী সমাজের সামনে যেন এক স্বপ্নের জগতকে উপস্থাপন করে। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত একমাত্র দেশ যারা ঘোষণা করতে পেরেছিল, 'আমাদের দেশে কোনো বেকার নেই, ভিক্ষুক নেই, পতিতা নেই।' দেশের যে সমস্ত আইনে নারীদের হেয় করে রাখা হয়েছিল, বিপ্লবের পর সে সমস্ত আইন সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়েছিল। শুধু আইনেই নয় সমস্ত ক্ষেত্রে সম-অধিকার ও মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করা হয়েছিল। অন্য কোনো দেশে এখনও পর্যন্ত নারীরা সোভিয়েত নারীদের মতো পরিপূর্ণ স্বাধীনতা ও সমান অধিকার পান না। অথচ ১৯১৭ সালের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে রাশিয়া ছিল ইউরোপের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া দেশগুলোর একটি। নারীর অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়; জীবন ছিল ভীষণ অবমাননার। খুব দুর্বল ও পশ্চাদপদ অবস্থা থেকে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সঠিক ব্যবহার ও জনগণের বিপুল উদ্দীপনাময় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন সারা বিশ্বের সামনে উন্নয়নের যে চিত্র হাজির করেছিল তা শিল্পোন্নত দেশগুলোকেও ম্লান করে দিয়েছিল। বিপ্লবকালীন সময়ে রাশিয়ার চেয়ে শিল্প ও অবকাঠামোয় অনেক উন্নত ছিল আমেরিকা। কিন্তু বিপ্লবের

পর খুব দ্রুতগতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আমেরিকাকে সকল দিক থেকে প্রায় অতিক্রম করে যাচ্ছিল। ১৯৪০ সালের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরা বিশ্বের সবচেয়ে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের মেয়েরা সবচেয়ে অধিকারসম্পন্ন শিক্ষিত সুস্থ মানুষ হিসেবে দাঁড়াতে সক্ষম হন। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত মুসলিম প্রজাতন্ত্রের মেয়েরা সমগ্র মুসলিম বিশ্বের মধ্যে বৈষয়িক ও মানসিক উভয়দিক থেকেই প্রকৃত স্বাধীন ও অগ্রসর নারী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন।

নারী ও পুরুষ মিলেই মানব সমাজ গঠিত। সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর নারী-পুরুষে বৈষম্য সৃষ্টি হয়। নারী-পুরুষের পার্থক্য প্রাকৃতিক কিন্তু বৈষম্য সমাজসৃষ্ট। বৈষম্যকে স্থায়ী করতে, বাড়াতে কত নিয়ম-কানুন, শাস্ত্রের বিধি-বিধান যে তৈরি হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াস ছাড়া সমাজ এগোবে না। নারী-পুরুষ তাই পরস্পরের প্রতিপক্ষ নয় বরং সহযোগী। পরস্পরকে সহযোগিতা করলে সমাজ যে কত গণতান্ত্রিক, মানবিক এবং আধুনিক হতে পারে তার এক অনুপম দৃষ্টান্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন সৃষ্টি করেছিল। আর তা পেরেছিল মানব মুক্তির মহান আদর্শ মার্কসবাদ-লেনিনবাদ এর ভিত্তিতে সমাজ-রাষ্ট্র পরিচালনার ফলে। আজও যারা নারীমুক্তি ও মানবিক মর্যাদার সমাজ গড়ার জন্য লড়ছেন তাদের জন্য এ এক প্রয়োজনীয় শিক্ষা।

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম তার সীমিত সাধ্যে ও সর্বোচ্চ আন্তরিকতায় সোভিয়েত রাষ্ট্রে নারী সমাজের অর্জনসমূহ আজকের দিনের মানুষের সামনে তুলে ধরতে চায়। সেই লক্ষ্যেই আমাদের এই প্রচেষ্টা। সাথে আমরা যুক্ত করেছি 'নারী প্রশ্নে লেনিন' প্রবন্ধটির অংশবিশেষ। ১৯২০ সালে আন্তর্জাতিক নারীমুক্তি আন্দোলনের নেত্রী ক্লারা জেটকিন রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মহান নেতা কমরেড লেনিনের সাথে নারীমুক্তি প্রসঙ্গে আলোচনা করেন এবং পরবর্তীতে 'নারী প্রশ্নে লেনিন' শিরোনামে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধ শ্রমজীবী নারীদের আন্দোলন, নারী সংগঠনের নীতি ও নারীমুক্তি আন্দোলনের নীতিগত ও পদ্ধতিগত বিষয়গুলোকে অনুধাবন করতে সহযোগিতা করবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

শুভেচ্ছাসহ

রওশন আরা রুশো
সভাপতি

শম্পা বসু
সাধারণ সম্পাদক

পূর্ব কথা

নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রদানের অর্থাৎ নারী ও পুরুষের সমমর্যাদার দাবি প্রথম উঠেছিল ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে। আর এর জমিন প্রস্তুত করেছিল রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। ঐ সময়ে নারীর অবস্থা ছিল খুবই করুণ। সে সময় ইউরোপে নারীকে অর্ধ-মানুষ হিসেবে ভাবার প্রবণতা বেশি ছিল। বলা হতো, মুরগি যেমন পাখি নয়, নারীও তেমনি মানুষ নয়। বলা হতো, নারী অবলা, সে পুরুষের তুলনায় দুর্বল ও নিকৃষ্ট। বিভিন্ন ধর্মীয় নৈতিকতায় নারীকে 'নরকের দ্বার' বা 'সকল পাপের উৎস' হিসেবে দেখানো হয়েছে যা নারী সম্পর্কে গোটা সমাজের মনোভাব নির্ধারণ করে দিয়েছিল। এছাড়া একদিকে রাজা, বাদশাহ, জমিদার ও সামন্ত-ভূস্বামীর ভোগের লালসা চরিতার্থ করার জন্য নারীদের ওপর চলত নানা ধরনের দৈহিক অত্যাচার, যে ব্যাপারে রাজতন্ত্রের অনুগামী অভিজাত সম্প্রদায়ও ব্যতিক্রম ছিল না। সর্বোপরি ছিল ধর্মতন্ত্র অর্থাৎ গির্জা বা চার্চ ও পুরোহিতদের দাপট, অন্যায় অনুশাসন ও জবরদস্তি; অপরদিকে পারিবারিক জীবনে পুরুষের নির্মম আচরণ ও চরম অবমাননা। এসব কিছুই নারীর জীবনকে করে তুলেছিল দুর্বিষহ। মানুষ হিসেবে নারীর স্বীকৃতি ছিল না, ছিল না কোনোরূপ সামাজিক অধিকারও।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে মানুষের চিন্তা ও কর্মের জগতে যে বিপুল আলোড়ন তৈরি হয়েছিল আমরা যাকে বলি রেনেসাঁ বা নবজাগরণ তার মূলমন্ত্র ছিল মানবতাবাদ। মানুষকে কেন্দ্রে রেখে জগতের সমস্ত কিছুকেই নতুন করে বিচার করে দেখার, যুক্তিবাদ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার আলোকে দেখার এই ঢেউ সেদিন আছড়ে পড়েছিল গোটা ইউরোপ জুড়ে।

মানবসমাজকে বিচার-বিশ্লেষণ করার, এর গতি-প্রকৃতি নিরূপণ করারও প্রচেষ্টা শুরু হলো। প্রচলিত সমস্ত প্রথা, রীতি, বিশ্বাস—সবকিছুকেই মানুষ প্রশ্নবিদ্ধ করল, যুক্তির আলোয় যাচাই করা শুরু করল। সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থা, পুরুষের কর্তৃত্ব, নারীর অধিকারহীনতা, নারীকে পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট মনে করা ইত্যাদি বিষয়ও প্রশ্নের মুখে পড়ল। মানুষ জানতে পারল যে মানুষের ওপর মানুষের শোষণ কোনো প্রাকৃতিক নিয়ম নয়। নারীর অধস্তন অবস্থাও প্রাকৃতিক বা চিরায়ত কোনো বিধান নয়। আওয়াজ উঠল, নারীকে মানুষ হিসেবে দেখতে হবে, মানুষের মর্যাদা দিতে হবে।

ইতিহাস অনুসন্ধানে মানুষ জানতে পারল, মানুষের সমাজ চিরকাল এ অবস্থায় ছিল না, নারীর অবস্থাও চিরকাল এ রকম ছিল না। মানব সমাজ গঠনের গোড়া থেকে আজ পর্যন্ত সমাজ বিকাশের ধারায় নারী-পুরুষ মিলে মানব সভ্যতাকে ধাপে ধাপে বর্তমান অবস্থায় নিয়ে এসেছে। আদিতে মানুষের সমাজ ছিল শ্রেণিহীন; ওই সমাজকে বলা হতো আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ। আমরা এও জানি যে ওই সমাজ ছিল মাতৃপ্রধান, যদিও নারী এবং পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আদিম পরিপূরক সহযোগিতার ভিত্তিতে প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করত এবং শিকার, ফলমূল আহরণসহ নিজেদের প্রয়োজনীয় উৎপাদন করত। ইতিহাস এ কথাও সাক্ষ্য দেয় যে উদ্যান-কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভাবন, ক্ষেত্র-কৃষি ও পশুপালনের সূচনায়ও নারীর ভূমিকা ছিল প্রধান। সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি উদ্ভব হওয়ার মধ্য দিয়ে সমাজ শ্রেণিবিভক্ত হওয়ার পর নারী জাতি সমাজের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বিচ্যুত হয়। সম্পত্তির উপর কায়েম হয় পুরুষের মালিকানা এবং সমাজ পরিচালনার আধিপত্যে চলে আসে পুরুষ—কায়েম হয় পুরুষতন্ত্র। সহযোগিতামূলক সম-মর্যাদার অবস্থান থেকে নারী চলে আসে পুরুষের অধস্তন অবস্থানে।

এ বিষয়টি তুলে ধরতে গিয়ে মনীষী কার্ল মার্কসের সহযোগী মহামতি ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'জননী-বিধির[১] উচ্ছেদ হচ্ছে নারীজাতির বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহের কর্তৃত্বও অধিকার করে, নারী অবনমিত হয়। তাকে গোলামি স্বীকার করতে বাধ্য করা হয়। নারী তখন পুরুষের কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার ক্রীতদাস আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয়।' তিনি উল্লেখ করেন, 'ঘরকন্নার কাজের আর কোনো সামাজিক চরিত্র রইল না। ঘরকন্নার কাজ ব্যক্তিগত সেবাবৃত্তিতে পরিণত হলো। সামাজিক উৎপাদনের কাজে অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হয়ে স্ত্রী হয়ে গেল সর্বপ্রথম গৃহদাসী।'

১. মায়ের দিক থেকে উত্তরাধিকার নির্বাচন করার পদ্ধতি

ইতিহাসের ধারায় দাস সমাজ ও সামন্ত সমাজ পেরিয়ে সমাজ উপস্থিত হলো পুঁজিবাদী সমাজে। শিল্পবিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সস্তা শ্রম লুণ্ঠনের অংশ হিসেবে নারীকেও ঘরের বাইরে টেনে আনা হলো। 'কেবল মাত্র আধুনিক বৃহৎ শিল্পই আবার নারীর সামনে এবং কেবলমাত্র সর্বহারা শ্রেণির নারীর সামনে—সামাজিক উৎপাদনের পথ খুলে দিলো।'[১] কিন্তু এ সমাজেও নারী যে কেবল শ্রমশোষণের শিকার তাই নয়, সে অবনমিত, পুরুষের অধীন। 'আধুনিক ব্যক্তিগত পরিবারগুলো প্রকাশ্যে বা প্রচ্ছন্নভাবে নারীদের গৃহদাসত্বের ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে। ...পরিবারের মধ্যে পুরুষ বুর্জোয়া, আর স্ত্রী সর্বহারা।'[২]

নারীর অধস্তন অবস্থা আর সমাজের শোষণ-নিপীড়নের সম্বন্ধ ঐতিহাসিকভাবে অবিচ্ছেদ্যরূপে জড়িয়ে আছে। ফলে যতদিন পর্যন্ত সমাজে ধনী-গরিবের বৈষম্য থাকবে, এক শ্রেণি কর্তৃক অন্য শ্রেণির শোষণের অবসান না ঘটবে ততদিন পর্যন্ত সামগ্রিক সমাজের অংশ হিসেবে নারীর ওপর পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতা ও সমাজের অর্থনৈতিক শোষণের অবসান ঘটবে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণি ও শোষণ বিলোপের ঘোষণা ও প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কারণে রাষ্ট্রীয়ভাবে শ্রেণি-শোষণ থেকে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে শ্রমিকশ্রেণির মুক্তি, পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও যৌনদাসত্ব থেকে নারীমুক্তির সূচনা হয়। তারপরও পরিবার, সমাজে দীর্ঘকাল ধরে গড়ে ওঠা বস্তুগত ও ভাবগত বৈষম্যের অবশেষ ও ভোগবাদী সংস্কৃতির কিছু উপাদান থেকে যাওয়ার কারণে শ্রেণিহীন সাম্যবাদী সমাজে গিয়েই নারী প্রকৃত মুক্তি লাভ করবে। তাই বর্তমান সময়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামই নারীমুক্তি আন্দোলন বিকাশের সঠিক পথ।

মহান অক্টোবর বিপ্লবের দিনগুলোতে নারী যোদ্ধারা

মহান অক্টোবর বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেছিলেন সকল স্তরের নারীরা। একজন যোদ্ধা, মহান অক্টোবর বিপ্লবের একজন নেতা আলেকজান্দ্রা কোলনতাই তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন এভাবে, 'তারা দলে দলে ছিলেন, দশক, শতক, হাজার নামহীন বীরাঙ্গনারা, যারা লাল পতাকা আর সোভিয়েত শ্লোগানের পেছনে শ্রমিক এবং কৃষকদের পাশাপাশি অভিযান চালিয়েছে। জারের ধর্মীয় শাসনতন্ত্রের ধ্বংসাবশেষ পেরিয়ে এক নতুন ভবিষ্যতের দিকে...।

১. ও ২. পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি—ফ্রেডরিক এঙ্গেলস

কেউ যদি অতীতের দিকে ফিরে তাকান, তাদের দেখতে পাওয়া যাবে, নামহীন বীরাঙ্গনাদের এই সারি, উপোসী শহরগুলোতে অক্টোবর যাদের দেখেছিল, যুদ্ধে বিধ্বস্ত নিঃসম্বল গ্রামগুলোতে ...তখনও মাথায় রুমাল (কদাচিৎ, তখনও লাল রুমাল), একটা পুরনো স্কার্ট, একটা তাপ্পি লাগানো শীতের জ্যাকেট...তরুণী এবং বৃদ্ধা, নারী শ্রমিক এবং সৈন্যের স্ত্রী, কৃষক নারী এবং শহরের গরিবদের মধ্য থেকে গৃহবধু। সেই দিনগুলোতে অনেক বেশি বিরলভাবে, অফিসের কর্মচারীরা এবং পেশাদার নারীরা, শিক্ষিত এবং রুচিশীল নারীরা সংযুক্ত ছিলেন। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে থেকে এমন নারীরাও ছিলেন যারা লাল পতাকা অক্টোবরের বিজয় পর্যন্ত বহন করেছিলেন— শিক্ষিকা, অফিস কর্মচারী, উচ্চবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ ছাত্রী, নারী চিকিৎসক। তাঁরা আনন্দের সাথে স্বার্থহীনভাবে, সচেতনভাবে অভিযানে অংশ নিয়েছিলেন। যেখানে পাঠানো হয়েছে সেখানেই তাঁরা গিয়েছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে যেতে হবে? তাঁরা সৈনিকের টুপি পরেছিলেন এবং রেড আর্মি-র যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিলেন। তাঁরা লাল হস্তবন্ধনী পরতেন আর গাটচীনায় কেরেনেস্কির বিরুদ্ধে লাল বাহিনীকে সাহায্য করতে প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে ছুটে যেতেন। সৈন্যবাহিনী, যোগাযোগ-ব্যবস্থায় তাঁরা কাজ করতেন। তাঁরা আনন্দের সাথে কাজ করতেন, এই বিশ্বাসে ভরপুর হয়ে যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু হচ্ছে এবং আমরা সকলেই বিপ্লবের একমাত্র শ্রেণিতে সামান্য অংশীদার। গ্রামে কৃষক-নারীরা (তাদের স্বামীদের যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো হয়েছিল) জমিদারদের কাছ থেকে জমি নিয়েছিলেন এবং অভিজাততন্ত্রকে তার শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বানানো আরামদায়ক বাসা থেকে তাড়িয়ে বের করে দিয়েছিলেন।

যখন কেউ অক্টোবরের ঘটনাগুলোকে স্মরণ করেন, তিনি ব্যক্তির মুখ দেখেন না, দেখেন জনতার। সংখ্যাহীন জনতা, মানবতার তরঙ্গের মতো। আবার যেদিকেই তাকানো যাক না কেন, দেখা যাবে নারী—সভায়, জমায়েতে, বিক্ষোভে...।

তাঁরা এখনও নিশ্চিত নন যে তাঁরা ঠিক কী চান, কী জন্যে তাঁরা লড়ছেন, কিন্তু তাঁরা একটা জিনিস জানেন—তাঁরা আর যুদ্ধ সহ্য করবেন না। তাঁরা জমিদার আর সম্পত্তিবানদের চান না ...১৯১৭ সালে, মানবতার বিশাল মহাসাগরে উত্থানপতন ঘটেছিল, সেই মহাসাগরের একটা বড় অংশ নারী...।'[১]

---

১. মহান অক্টোবর বিপ্লবের দিনগুলোতে নারীযোদ্ধারা—আলেকজান্দ্রা কোলনতাই

সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের সাথে নারীমুক্তির প্রশ্ন অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত

নারীমুক্তির সংগ্রাম সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণেরই অংশ। ১৮৬৬ সালে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী সম্মেলনে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, 'নারীদের নানারকম অর্থনৈতিক বন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া না গেলে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম ব্যর্থ হবে।' ব্যক্তিগত মালিকানা ব্যবস্থা না থাকলে নারী-পুরুষে শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই নয় পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও বৈষম্য থাকবে না—কেউ কারো অধীন থাকবে না এবং সেটা কীভাবে ঘটবে তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন ফ্রেডরিক এঙ্গেলস তাঁর 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' বই-এ। ফ্রেডরিক এঙ্গেলস লিখেছেন, 'উৎপাদনের উপায় সমাজের সম্পত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তিগত পরিবারগুলো আর সমাজের অর্থনীতির একক (Unit) থাকবে না। ব্যক্তিগত গৃহস্থালি পরিণত হবে সামাজিক শিল্পে। শিশুর পরিচর্যা ও শিক্ষা হয়ে উঠবে সামাজিক ব্যাপার, বিবাহ বন্ধনের মারফত বা তার বাইরে, শিশু যেভাবেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সমাজ তাদের সকলের সমান দায়িত্ব নেবে। এইজন্যই ভবিষ্যৎ ফলাফলের দুশ্চিন্তা নীতিগত ও অর্থনৈতিক উভয়দিক থেকে যেটি আজ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ—যে জন্য একজন নারী যাকে ভালোবাসে সেই পুরুষের কাছে অবাধে আত্মসমর্পণ করতে পারে না—সেই কারণ আর থাকবে না। ...সেটি দেখা যাবে নতুন পুরুষ গড়ে ওঠার পর, এমন সব পুরুষ যাদের কখনও পয়সা বা অন্য কোনো সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে কোনো স্ত্রীলোককে খরিদ করার কারণ ঘটেনি, আর এমন সব নারী যারা সত্যিকার প্রেমের অনুভূতি ছাড়া আর কোনো কারণে পুরুষের কাছে আত্মদানে কখনো বাধ্য হয়নি অথবা যাদের কোনো অর্থনৈতিক ফলাফলের ভয়ে প্রণয়পাত্রের কাছে আত্মদানে বিরত হতে হয়নি।'

আমরা এসবেরই প্রতিফলন দেখতে পাই সোভিয়েত রাশিয়ায়। রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাত্র ৩ বছরের মাথায় ১৯২০ সালে কমরেড লেনিন বলেছিলেন, 'আইনের দিক থেকে স্বভাবতই পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার রয়েছে এবং সর্বত্রই এই সমান অধিকার কার্যে পরিণত করার জন্য আন্তরিক ইচ্ছার প্রমাণ দেখা যায়। আমরা নারীদের সামাজিক অর্থনীতির জন্য আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের মধ্যে নিয়ে আসছি। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত—যাতে তারা তাদের জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা, সামাজিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। আমরা সাধারণ রান্নাঘর, যৌথ রন্ধনশালা ও আহারগৃহ, ধোপাখানা ও মেরামতের দোকান, শিশু বিদ্যালয়,

কিন্ডারগার্টেন, শিশু প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছি। সংক্ষেপে, আলাদা আলাদা ঘরকন্নার অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্মগুলোকে সামাজিক দায়িত্বে পরিণত করার প্রোগ্রাম আমরা গুরুত্বের সঙ্গে কাজে পরিণত করছি। তার অর্থ দাঁড়াবে সাবেকি ঘরকন্নার একঘেয়েমি থেকে ও পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা থেকে নারীদের মুক্তিলাভ। তার দ্বারা নারীরা সম্পূর্ণরূপে তাদের নিজেদের প্রতিভা, ক্ষমতা ও আগ্রহ কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। শিশুরাও বাড়ি অপেক্ষা অনেক ভালো অবস্থায় মানুষ হচ্ছে। আমাদের নারী শ্রমিকদের জন্য যে রক্ষণমূলক আইন আছে তা পৃথিবীর অন্য সব দেশের আইনের চেয়ে বেশি অগ্রগামী এবং সংগঠিত শ্রমিকরা, সরকারি কর্মচারীরা সেগুলো কার্যকরী করে। আমরা প্রসূতি হাসপাতাল খুলছি, মা ও শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠান খুলছি, মাতৃ শিক্ষাসদন খুলছি, শিশুপালন সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করছি, মা ও শিশুদের যত্ন কী করে নিতে হয় সে সম্বন্ধে প্রদর্শনী এবং এই রকম অনেক কিছুর ব্যবস্থা করছি। বেকার এবং সংস্থানহীন নারীদের ভরণপোষণের জন্য আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চেষ্টা করছি।'[১]

সোভিয়েত ইউনিয়ন নারীদের অধিকারের বিষয়কে কতটা গুরুত্ব দিয়েছিল তা কমরেড লেনিনের পরের কথাগুলো থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'আমরা এ কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে শ্রমজীবী নারীদের প্রয়োজনের তুলনায় এ সব কিছুও যথেষ্ট নয়—তাদের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার থেকে এ অনেক কম। কিন্তু তবুও যে সব দেশে ধনতন্ত্রের অবাধ শাসন চলছে সে সব দেশের তুলনায় এ অনেক বেশি। সঠিক দিকে আমাদের শুভ সূচনা হয়েছে এবং আমরা আরও অনেক উন্নতি করব। বিশ্বাস করুন, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তা করব।'[২]

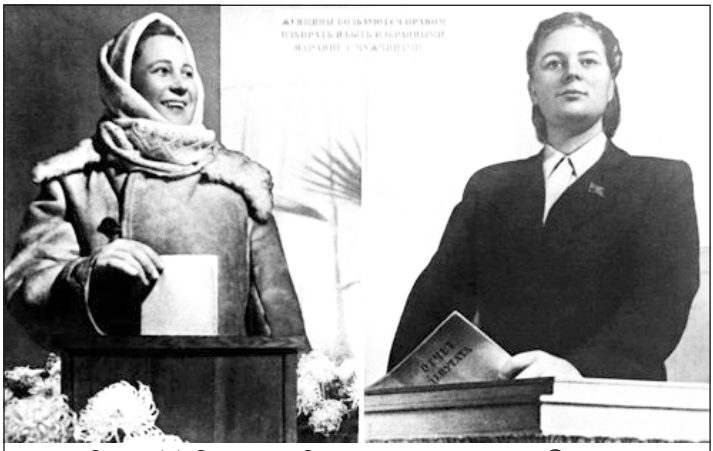
নারীর সমঅধিকার বা নারীমুক্তিকে অগ্রাধিকার বা গুরুত্ব দেওয়া নারীর প্রতি করুণার বিষয় নয়। পুঁজিবাদী অর্থনীতি ও তার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এ বড় জরুরি বিষয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাই লেনিন বলেছিলেন, 'সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতিটি দিনই বেশি করে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে নারীদের ছাড়া আমাদের অগ্রগতি অসম্ভব।'[৩]

সোভিয়েত আইনে নারী অধিকার

আমরা জানি সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে বিলোপ হয় না। তারপরও নারীমুক্তির প্রশ্নে সোভিয়েত রাষ্ট্র যেসব পদক্ষেপ নিয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল সেই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়া। বিপ্লবের পর পরই ১৯১৮ সালে

১, ২ ও ৩ নারী প্রশ্নে লেনিন—ক্লারা জেটকিন

নারীদের ভোটাধিকার দেওয়া হলো, তখনও পর্যন্ত ইউরোপের ডেনমার্ক ও নরওয়ে ছাড়া বিশ্বের অন্য কোথাও নারীদের ভোটাধিকার ছিল না। যে সমস্ত আইন সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় নারীকে অবদমিত করতে সাহায্য করত বিপ্লবের পরে প্রথমেই তা সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হলো। নারীকে ঘোরাফেরার ক্ষেত্রে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হলো। বিপ্লবের আগে আইন ছিল যে, স্বামী যেখানে যাবে স্ত্রীও স্বামীর সাথে যেতে বাধ্য থাকবে। জমির উপর মালিকানা স্বত্বের ক্ষেত্রে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হলো এবং পরিবারের কর্তা হিসেবে (Head of household) গণ্য হওয়ার বাধাও দূর করা হলো। নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেয়ে



সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানের ১৩৭ ধারা অনুযায়ী পুরুষদের মতো নারীরও সমান ভোটাধিকার রয়েছে। এই পোস্টারে শ্লোগান লেখা হয়েছে— সোভিয়েত নারীর সমান অধিকারকে অভিনন্দন!

বড় প্রতিবন্ধকতা ছিল চার্চের কর্তৃত্ব ও অনুশাসন। বিপ্লবের পর রাষ্ট্রের সঙ্গে চার্চের সমস্ত সম্পর্ককে ছিন্ন করা হলো। বিয়ে, শিশুর জন্মের পর নথিভুক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর চার্চের কর্তৃত্ব আর রইল না এবং নারীকে গর্ভপাতের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্ণ অধিকার দেওয়া হলো। দুইজনের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে খুব সহজ এক রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিয়ে করার পদ্ধতি চালু করা হলো। স্ত্রীকে স্বামীর পদবি গ্রহণ করার কোনো আইনি বিধানও থাকল না। ১৯২৬ সাল থেকে বিয়ে রেজিস্ট্রেশনের আইনও তুলে দেওয়া হলো। শিশুর জন্ম বিবাহিত সম্পর্কের মধ্য দিয়ে হোক বা তার বাইরে হোক রাষ্ট্রের কাছে সকল শিশুই ছিল সমান, অর্থাৎ অবৈধ সন্তানের ধারণাকে বাতিল করা হলো।

নারীদেরও পুরুষের মতো একই বেতনে সমস্ত স্তরে কাজের অধিকার স্বীকৃত হলো; তখন পর্যন্ত কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রেই সমকাজে সমমজুরির ব্যবস্থা ছিল না। মাতৃত্বকালীন সময়ে সমস্ত রকম সুবিধা ও অধিকার সোভিয়েত রাষ্ট্রের দিক থেকে নিশ্চিত করা হলো। প্রতিটি নারীর কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হলো এবং দেশ থেকে পতিতাবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিলোপ করা হলো। আজ পর্যন্ত কোনো বুর্জোয়া রাষ্ট্রে এই সামাজিক ব্যাধিকে দূর করার কথা কেউ কল্পনাও করতে পারে না, বরং বুর্জোয়া ব্যবস্থায় নারীর দেহকে বাজারের পণ্য হিসেবে বেচাকেনার জন্য পতিতাবৃত্তিকে বুর্জোয়া রাষ্ট্রই বাঁচিয়ে রাখে।

১৯১৯ সালে 'মহান সূচনা' প্রবন্ধে মহামতি লেনিন লিখেছিলেন, '... নারীদের অবস্থার কথাই ধরা যাক। ক্ষমতা হাতে পাওয়ার প্রথম বছরেই আমরা এ বিষয়ে যতটা করেছি পৃথিবীতে এমন একটিও গণতান্ত্রিক দেশ নেই যে দেশ বছরের পর বছর ধরে তার শতাংশের এক অংশও করতে সক্ষম হয়েছে। এমনকি সবচেয়ে উন্নত বুর্জোয়া রিপাবলিকান দেশও নয়। এ কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে, যে সব আইন পুরুষের কাছে নারীকে হেয় করে রেখেছিল, বিবাহ-বিচ্ছেদের যে সব বাধা-নিষেধ ও বিরক্তিকর পদ্ধতি ছিল, জারজ সন্তানদের সম্বন্ধে ও তাদের পিতাদের অনুসন্ধান করে বেড়ানো প্রভৃতি বিষয়ে যে সব জঘন্য আইন ছিল, আমরা তার লেশমাত্র চিহ্নও অবশিষ্ট রাখিনি। সমস্ত সভ্য দেশের এই ধরনের বহু প্রচলিত আইন বুর্জোয়া ও ধনতন্ত্রের কলঙ্কের পরিচয় দিয়ে থাকে। এ বিষয়ে আমরা যা করেছি তার জন্য হাজার বার গর্বিত হওয়ার অধিকার আমাদের আছে।'

সংবিধান তৈরির সময় ঠিক করা হলো—'সমস্ত রকম অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অন্যান্য সার্বজনীন ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ইউ. এস. এস. আর-এর নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার পাবে। এই সমান অধিকার কাজে পরিণত করার সম্ভাবনা নিম্নোক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত—নারীদের পক্ষে পুরুষদের সঙ্গে সমান কাজ করার অধিকার, সমান বেতন পাওয়ার, বিশ্রাম পাওয়ার ও অবসর বিনোদনের অধিকার, সামাজিক বীমা এবং শিক্ষা, মা ও শিশুর স্বার্থকে রাষ্ট্রব্যবস্থা দ্বারা রক্ষা করা, বড় পরিবারের মা আর অবিবাহিতা মা-কে রাষ্ট্রীয় অর্থ সাহায্য, পুরো বেতনে মাতৃত্বের ছুটি এবং অত্যন্ত ব্যাপকভাবে মাতৃসদন (Maternity Homes), শিশুসদন (Nurseries) ও খেলাঘর (Kinder-garten)-এর জাল বিস্তার করা।'[১] শুধু সংবিধানে লিখে রাখা নয়, সোভিয়েত রাষ্ট্র এ সবই বাস্তবায়ন করেছিল।

১. নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অবমাননার জীবন আর নয়

বিপ্লবের আগে রাশিয়াতে নারীদের অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। কমরেড জে ভি স্তালিন বলেছিলেন, ''আগেকার দিনের মেয়েদের ঠিক কী রকম অবস্থা ছিল তা একবার ভেবে দেখা যাক। বিয়ের আগে পর্যন্ত মেয়েকে সবচেয়ে অধম চাকরানি মনে করা হতো। বাপের সংসারে সে গতর খাটাতো, উদয়াস্ত গতর খাটাতো, তবু বাপ তাকে ধমকে বলত, 'মনে রাখিস, তুই আমার অন্ন ধ্বংস করিস!' বিয়ের পর স্বামীর সংসারে সে গতর খাটাতো, স্বামীর যেমন মর্জি তেমনিভাবেই। তবু স্বামী তাকে ধমক দিয়ে বলত, 'মনে রাখিস, তুই আমার অন্ন ধ্বংস করিস!' গ্রামের মধ্যে মেয়েদের অবস্থাই ছিল সবচেয়ে শোচনীয়।''[১]

১৯০৩ সালে বিশ্বখ্যাত সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কির লেখা নাটক 'দি লোয়ার ডেপথ'-এ তালা-মিস্ত্রির স্ত্রী আন্না বলছে 'আমি এমন একটা দিন মনে করতে পারছি না যে দিন পেটে খিদে নিয়ে ঘুমাতে যাইনি। ...যখন জেগে থাকি, খাই, ঘুমাই—আমি ভয়ে ভয়ে থাকি ...পুরোটা জীবন আমি ভয়ে থরথর করে কেঁপে কাটালাম এই ভেবে যে পরের গ্রাসটা আর বোধ হয় পাবো না ...আমার হতদরিদ্র জীবনটা শতচ্ছিন্ন নেকড়া জড়িয়ে কাটালাম...।' এই রকমই ছিল রাশিয়ায় নারীদের জীবন। বিপ্লবের আগে রুশ দেশে যেসব নারীরা কারখানায় কাজ করত তাদের অবস্থাও একই রকম শোচনীয়। দেশের একটা আইন দেখলেই সমস্ত নারীদের অবস্থাটা আঁচ করা যায়। জার আমলে ১০৭ ধারার আইন ছিল—'স্বামীই পরিবারের প্রধান কর্তা, স্ত্রীর কর্তব্য হলো স্বামীর অনুগত হওয়া।' তবু এত অসম্ভব নির্যাতন সত্ত্বেও, খোদ রুশ নারীদের অবস্থা বিভিন্ন জাতিসত্তা যেমন উজবেক, তুর্কমেনিয়া, তাজিক, আজারবাইজান প্রভৃতি জায়গার নারীদের তুলনায় যেন স্বর্গের অপ্সরাদের মতো। মধ্য এশিয়ার বোখারা অঞ্চলের নারীদের লেখা এক চিঠি থেকে বিপ্লবের আগে ঐসকল জাতিসত্তার নারীদের জীবন কত অবমাননার ছিল তা বুঝতে পারা যায়। চিঠির অংশবিশেষ এমন—'বোখারার জমিকে সিক্ত করেছে অনেক মেয়ের চোখের জল। সারাজীবন ধরে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই চোখের জল, একে কখনও ভোলা যায় না। আমীর আমলের বোখারায় প্রত্যেক মেয়েদের পাঁচজন করে প্রভু—তার প্রথম ও প্রধান প্রভু হলো আল্লাহ্, দ্বিতীয় প্রভু আমীর, তৃতীয় প্রভু মনিব, অর্থাৎ জমি আর পানির মালিক, চতুর্থ প্রভু হলো মোল্লা আর পঞ্চম প্রভু তার স্বামী! নগদ টাকায় আমাদের বিক্রি

১. নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

করা হতো, বিনিময় করা হতো যে কোনো পণ্যের সঙ্গে। আমরা ছিলাম আমাদের স্বামীদের ক্রীতদাসী।'[১] কয়েকটি জাতিসত্তার মানুষদের ক্ষেত্রে দেখা যেত, স্ত্রীর সতীত্বে কোনো রকম সন্দেহ জাগলে স্বামীরা স্ত্রীদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে গরুর গাড়িতে বেঁধে চাবকাতে চাবকাতে গ্রাম ঘুরিয়ে আনত।

অথচ বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার কাজে এই নারীরাই এগিয়ে এসেছে পুরুষের পাশাপাশি, সমানে সমান হয়ে। ১৯৩৫ সালে বিপ্লবের আঠারো বছর পরের পরিসংখ্যান মতে, 'দেশের যত শিক্ষক আর যত ডাক্তার তার মধ্যে তিনভাগের দুইভাগই হলো নারী, কৃষিবিদ্যায় যারা বিশেষজ্ঞ তাদের মধ্যে একটা মস্ত বড় অংশ নারী। বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক বিভাগে গবেষণার কাজে পুরুষদের অনুপাতে নারীদের সংখ্যা বড় কম নয়। কারখানার ওস্তাদ কারিগরদের মধ্যে তিনভাগের এক-ভাগ হলো নারী। পুরো পাঁচ বছর ধরে তারা বিশেষজ্ঞ হওয়ার শিক্ষা পেয়ে থাকে। সৈন্য ও নৌবাহিনীতেও যোগ দিয়েছে নারীরা।'[২]

পারিবারিক ব্যবস্থা

বিপ্লবের আগে জারের রাশিয়ায় নারীরা সমস্ত রকম সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। বিশেষ করে স্বামীর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত অপমানজনক। প্রচলিত পরিবার কাঠামোয় পুরুষই ছিল সর্বেসর্বা, নারীর সিদ্ধান্তগ্রহণকারী কোনো ভূমিকাই বাস্তবে ছিল না; ফলে পরিবারে নারীর না ছিল নিজের কোনো আকাঙ্ক্ষা, না তার নিজের জন্য সময়, না নিজের জন্য কোনো অর্থ-সম্পদ। বিপ্লবের আগে স্বামী যতই স্ত্রীর ওপর নির্যাতন চালাক, মাদকাসক্তি ও অশালীন আচরণের মাধ্যমে তার জীবন দুর্বিষহ করে তুলুক, স্ত্রী ইচ্ছে করলেও আদালত থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদের অনুমতি সহজে পেত না। আদালতে আর্জি জানিয়ে মাসের পর মাস বা এমনকি বছরের পর বছর বসে থাকতে হতো; খোলা আদালতের সামনে খুলে বলতে হতো তাদের পরস্পরের জীবনের কুৎসিত ইতিবৃত্ত। তাছাড়া গরিব মেয়েদের সামর্থ্যও ছিল না আদালতের খরচ যোগানোর। সে যুগে বর-কনেকে গির্জায় গিয়ে বিয়ে করতে হতো এবং তাই ছিল একমাত্র আইনানুগ নিয়ম। ছেলেমেয়েদের ওপর বাবার ছিল সর্বপ্রথম অধিকার। অবশ্য অবৈধ সন্তানের বেলায় মাকেই তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হতো। এক্ষেত্রে আদালতের সাহায্য নেওয়ার কোনো অধিকার মায়ের ছিল না।

---

১ ও ২ নিষিদ্ধ কথা আর নিষিদ্ধ দেশ—দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সুস্থ ও সবল সমাজ গড়তে হলে সবার আগে দরকার মানুষের পরিবার ও বিবাহিত জীবনকে দৃঢ়ভাবে নতুন আদর্শে সংগঠিত করা—সোভিয়েত ইউনিয়ন বুঝেছিল এর গুরুত্ব এবং সেভাবেই অগ্রসর হয়েছিল নর-নারীর জীবনকে সমানাধিকারের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে। পারিবারিক সম্বন্ধের ওপরই সমাজের গঠনবিন্যাস অনেকটা নির্ভরশীল। সে কারণে বিপ্লবের কিছুদিন পরে ১৯১৮ সালের শরৎকালে সোভিয়েত সরকার 'জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু' এবং 'বিবাহ, পরিবার ও অভিভাবকত্ব' সম্বন্ধে বিস্তারিত আইন-কানুন প্রণয়ন করে। তারপরও বহু ছোটখাটো বিধান কার্যকরী হয়েছে বিশেষ করে ১৯৩৬ ও ১৯৪৪ সালে। এই বিধানগুলো গৃহীত হওয়ার আগে সোভিয়েত সরকার সেগুলো দেশবাসীর সামনে উপস্থিত করেছিল এবং জনসাধারণের মতামত ও সংশোধনগুলো বিচার করার পর সেগুলো সর্বসম্মতিক্রমে আইন হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সোভিয়েত-ব্যবস্থা একমাত্র লৌকিক বিবাহ (Civil Marriage) স্বীকার করত। কিন্তু তাই বলে গির্জার আচার ও অনুষ্ঠান মাফিক বিবাহে কর্তৃপক্ষ কোনো বাধা দিত না। বিপ্লবের পর আইন করে বিবাহ-বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

পারিবারিক ব্যবস্থা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা করতে গিয়ে আলেকজান্দ্রা কোলনতাই বলেছিলেন, '...নারী-পুরুষের উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট সমাজের শুধু এটাই বলার আছে, আপনারা তরুণ, আপনারা পরস্পরকে ভালোবাসুন। প্রতিটি মানুষের সুখভোগের অধিকার আছে। অতএব সুখে জীবন কাটান, সুখের পথ ফেলে পালিয়ে যাবেন না। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বিয়ে ছিল সত্যিই দুঃখের শেকল; কিন্তু এখন আপনারা বিয়ের ভয়ে ভীত হবেন না। সন্তান গ্রহণে ভয় পাবেন না। সমাজ প্রতিটা শিশুর জন্মের কারণে উৎফুল্ল হয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ ভাবনায় আপনাদের চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই; আপনাদের সন্তান ক্ষিধের জ্বালা বা শীতের কাঁপুনি কোনোটাই জানবে না। কমিউনিস্ট সমাজ প্রতিটা শিশুর যত্ন নেয় এবং তার ও তার মায়ের প্রতি বস্তুগত ও নৈতিক সহায়তা সুনিশ্চিত করে। সমাজ শিশুকে খাওয়াবে, বড় করবে, শিক্ষিত করে তুলবে।'[১]

বিপ্লবের পর নতুন পারিবারিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। সে বিষয়ে ১৯২০ সালে আলেকজান্দ্রা কোলনতাই 'কমিউনিজম ও পরিবার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'নর-নারীর পুরোনো সম্পর্কের জায়গায় বিকশিত হচ্ছিল নতুন এক সম্পর্ক; অনুরাগ ও কমরেডশিপের মিলন, যারা দুজনেই মুক্ত, দুজনেই

১. কমিউনিজম ও পরিবার—আলেকজান্দ্রা কোলনতাই

স্বাধীন, দুজনেই শ্রমিক—সাম্যবাদী সমাজের এমন দুই সমকক্ষ সদস্যের মিলন। আজ নারীর গার্হস্থ্য বন্ধন নেই, পরিবারের ভেতরে আর বৈষম্য নেই। সাহায্যহীন পরিত্যক্ত অবস্থা এবং সঙ্গে বাচ্চা যাকে মানুষ করতে হবে, এসবে নারীদের আর ভয় পাওয়ার দরকার নেই। কমিউনিস্ট সমাজে নারীকে আর তার স্বামীর উপর নির্ভর করতে হয় না, বরং নির্ভর করতে হয় নিজের কাজের উপর। তিনি তার নির্ভরতার জায়গা খুঁজে পাবেন আপন কর্মক্ষমতার মধ্যে, স্বামীর মধ্যে নয়। সন্তানের জন্য তার উদ্বিগ্ন হওয়ার কোনো দরকার নেই। তাদের দায়িত্ব নেবে শ্রমিক-রাষ্ট্র। বিবাহ, পারিবারিক জীবনকে পঙ্গুকারী যাবতীয় বস্তুগত হিসেব-নিকেশের উপাদানসমূহ দূর হবে। পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও বিশ্বাস আছে এমন দুজন মানুষের মিলনই হবে বিবাহ।'

গৃহস্থালির শ্রমকে সামাজিক শ্রমে পরিণত করা হলো

রাশিয়াতে বিপ্লবের ত্রিশ বা চল্লিশ বছর আগ থেকে শ্রমিক নারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল। শুধুমাত্র স্বামীর আয়ে সংসার চলছিল না, ফলে স্ত্রীকেও পরিবারের বাইরে কাজ খুঁজতে হচ্ছিল। দিনমজুর, ফেরিওয়ালি, কেরানি, ধোপানি এবং গৃহশ্রমিক হিসেবে বাড়ির বাইরে কাজ শুরু করেছেন এমন নারী শ্রমিকের সংখ্যা প্রত্যেক বছর বাড়ছিল। তাদের পারিবারিক জীবন কেমন ছিল তা সহজেই কল্পনা করা যায়। যদি স্ত্রী ও মা কম করে আটঘণ্টা সময় কাজের জন্য বাইরে কাটান আর কর্মস্থল থেকে বাসায় যাতায়াতের সময় ধরে সময়টা দশঘণ্টায় গিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কী ধরনের পারিবারিক জীবন সেখানে ছিল? তার বাড়ি অবহেলিত হতো, বাচ্চারা মায়ের কোনোরকম যত্ন ছাড়াই বেশিরভাগ সময়টাই বাইরে রাস্তায় রাস্তায় কাটাতো। যে নারী একাধারে স্ত্রী, মা, আবার শ্রমিকও তাকে এই সমস্ত ভূমিকা পালনের জন্য শক্তির প্রতিটি বিন্দু নিংড়ে দিতে হতো। তার স্বামীর মতো একই সময় তাকে কাজ করতে হতো কোনো কারখানায়, ছাপাখানায় কিংবা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে এবং তারপর ঘরে ফিরে তাকে ঘরকন্না ও সন্তান মানুষ করার মতো সময় খুঁজে বের করে নিতে হতো। এ অবস্থা শুধুমাত্র বিপ্লবের আগের জার আমলেই নয় বর্তমান সময়ের যেকোনো পুঁজিবাদী দেশের নারীদের জন্যই সত্য। পুঁজিবাদ নারীর কাঁধে এক অসম্ভব বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে; যা তাকে মজুরি শ্রমিকে পরিণত করেছে অথচ গৃহকর্ত্রী বা মা হিসেবে তার দায়ভার লাঘব করেনি। এই তিন দায়ভারের চাপে নারী কোনোরকমে বেঁচে থাকেন। তিনি কষ্ট পান, তার মুখ সর্বদাই কান্নায় ভিজে থাকে। মেয়েদের কাছে জীবন কোনোদিনই সহজ ছিল না, কিন্তু পুঁজিবাদের জোয়ালের মধ্যে কারখানা-

উৎপাদনের এই রমরমা বাজারে যখন লাখ লাখ নারী শ্রমিক কর্মরত, এর থেকে কঠিনতর ও সংকটময় জীবন যেন আর কখনোই ছিল না।

বিপ্লবের আগে জার আমলে শ্রমিক নারীদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে আলেকজান্দ্রা কোলনতাই 'কমিউনিজম এবং পরিবার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'যত বেশি বেশি করে মেয়েরা বাইরে কাজে বেরোন, পরিবার ততই অচল হয়ে পড়ে। যেখানে নারী-পুরুষ দুজনে দিনের ভিন্ন শিফটে কর্মরত, সেখানে স্ত্রীর হাতে তার সন্তানকে খাবার রেঁধে খাওয়ানোর সময়টুকুও নেই! যখন বাবা ও মা দুজনেই সারাদিন বাইরে কর্মরত, সন্তানের সঙ্গে কাটানোর মতো সামান্য কয়েক মিনিট সময় পর্যন্ত তারা পান না, তখন একজন সন্তান কীভাবে পিতা-মাতা সম্পর্কে জানবে? আগেকার দিনে বিষয়টা ছিল একেবারেই আলাদা রকমের। মা থাকতেন ঘরে, নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন ঘরকন্নার কাজে, বাচ্চারা থাকত তার আশে পাশে, তার নজরদারির মধ্যে। এখন দিনে কারখানার সাইরেন বেজে উঠলেই সাত সকালে একজন নারী-শ্রমিককে বাড়ি থেকে তাড়াহুড়া করে বেরিয়ে যেতে হয়। সন্ধ্যেবেলা আবার যখন সাইরেন বেজে ওঠে হন্তদন্ত হয়ে বাড়ি ফিরেই সাংসারিক দায়িত্বের সবচেয়ে



১৯২৮ সালে শ্রমিক নারীরা তাদের কারখানার যৌথ রন্ধনশালার খাবার ঘরে খাচ্ছেন।

জরুরিতম কাজগুলো তাকে যেনতেন প্রকারে শেষ করতে হয়। তারপর, পরের দিন সকালে আবার সেইকাজে বেরিয়ে পড়া; ঘুমের অভাবে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। বিবাহিত নারী শ্রমিকের কাছে জীবন যেন কর্মশালার মধ্যে জীবন কাটানোর মতো।' এর ফলে বিপ্লবের আগে ক্রমেই শ্রমিক নারীদের পারিবারিক বন্ধনগুলো আলগা হয়ে যাচ্ছিল এবং পরিবারিক জীবন চরম

সংকটময় হয়ে পড়েছিল। কিন্তু নারীর এই সাংসারিক কাজও খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়া সংসার একদিনও চলত না। ধনী পরিবারগুলোর মহিলাদের হয়তো টাকার বিনিময়ে গৃহশ্রমিক দিয়ে এসব করিয়ে নেওয়ার সুযোগ ছিল। কিন্তু গরিব মহিলাদের তো সে সুযোগ ছিল না।

সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের দেশের সমগ্র (ধনী-গরিব) নারী সমাজকে এই ক্লান্তিকর, একঘেয়ে, বিরক্তিকর সাংসারিক কর্তব্য থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তারা যৌথ রন্ধনশালা, ডে-কেয়ার সেন্টার সারাদেশে জালের মতো বিস্তৃত করেছিল। ফলে শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীর জীবন অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। সে সময় বিশ্বের বহু বুর্জোয়া দেশেই রেস্তোরাঁ, ডে-কেয়ার সেন্টার ছিল। কিন্তু এত দাম! শুধুমাত্র ধনী মহিলারাই এসকল সেবা কিনে নিতে পারতো। একমাত্র দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন যেখানে রাষ্ট্রীয়ভাবে এমন আয়োজন রাখা হয়েছিল। আলেকজান্দ্রা কোলনতাই এ সম্পর্কে 'কমিউনিজম এবং পরিবার' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'নারী-শ্রমিকের নিজের ফ্ল্যাট পরিষ্কার করতে হবে না, তা থেকে অব্যাহতি দিয়ে তার বদলে কমিউনিস্ট সমাজ এমন নারী এবং পুরুষকে নিযুক্ত করবে যাদের কাজ হবে সকালবেলা ঘুরে ঘুরে ঘরদোর সাফ করা। বড়লোকের স্ত্রীরা বহুদিন হলো এই বিরক্তিকর, ক্লান্তিকর সাংসারিক কর্তব্য থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছেন। তাহলে শ্রমজীবী মেয়েদের কেন এই বোঝা এখনও বয়ে বেড়াতে হবে? সোভিয়েত রাশিয়ার নারী শ্রমিকের অবশ্যই সমান আরাম ও উৎফুল্লতা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যে পরিবেষ্টিত থাকা উচিত যা এতদিন শুধু প্রচুর পয়সার মালিকেরই সাধ্যে কুলাতো। রান্নার সাথে সংগ্রামে, রাতের খাবার-দাবার বানানোর কাজে দিনান্তের অবসরটুকুও নারী-শ্রমিককে রান্নাঘরে ব্যয় করানোর বদলে কমিউনিস্ট সমাজ গণরেস্তোরাঁ, সামাজিক রন্ধনশালা গড়ে তুলছে। ...এমনকি পুঁজিবাদী ব্যবস্থাতেই এরকম প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে শুরু করেছে। সত্যি কথা বলতে কী, শেষ অর্ধশতাব্দী সময় যাবৎ ইউরোপের বড় বড় শহরগুলোয় রেস্তোরাঁ ও ক্যাফের সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে; বর্ষার বৃষ্টির পর ব্যাঙের ছাতার মতো তারা গজিয়ে উঠছে। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শুধুমাত্র তারা-ই রেস্তোরাঁয় খাওয়া-দাওয়া সেরে নিতে পারেন, যাদের পকেটে যথেষ্ট অর্থ আছে। কমিউনিস্ট ব্যবস্থায় প্রত্যেকেরই সাধারণ ভোজনালয়ে খাওয়ার সামর্থ্য থাকবে। নারী শ্রমিককে আর কাচাকাচির দাসত্ব করতে হবে না, অথবা মোজা রিপু করতে বা কাপড় জোড়া দিতে দিতে চোখ দুটো নষ্ট করে ফেলতে হবে না; জামা কাপড়গুলো প্রতি সপ্তাহে কেন্দ্রীয় লন্ড্রিতে দিয়ে আসবে আর কাচা, ইস্ত্রি করা জামাকাপড়গুলো পরে নিয়ে আসবে। এভাবে আর একটা কাজ কমে যাবে। বিশেষ বস্ত্র মেরামতি

কেন্দ্রগুলো নারী-শ্রমিকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেলাই করে যাওয়ার থেকে মুক্তি দেবে। এভাবে চার প্রকার গৃহশ্রম কমিউনিজমের বিজয়ের সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কমিউনিজম পারিবারিক দাসত্ব থেকে নারীকে মুক্ত করে তার জীবনকে করে তোলে আরও সমৃদ্ধ, আরও সুখি।'

সোভিয়েত সমাজ গড়ার শুরু থেকেই শহরের পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, বড় বড় যৌথ খাবারঘর খোলা হলো, খোলা হলো অজস্র শিশুপালন কেন্দ্র, ধোপাখানা, মেরামতখানা ইত্যাদি ইত্যাদি। দেশজুড়ে অজস্র হাসপাতাল খোলা হলো, যাতে আত্মীয়-স্বজনদের রোগের শুশ্রূষা করা, আঁতুড় তোলা-এ ধরনের ঘরের কাজও কমে যায়।

'ওয়ার্কর্স এডভোকেট' এর পরিসংখ্যান মতে, '১৯২০ সালের মধ্যে পেত্রোগ্রাদের শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ গণভোজনাগার থেকে খাদ্য সংগ্রহ করত এবং মস্কোর শতকরা ৬০ ভাগ মানুষ গণরেস্তরাঁয় খাওয়ার জন্য নাম তালিকাভুক্ত করত।'[১]

সন্তান প্রতিপালনের দায়িত্ব রাষ্ট্রের

জার আমলের রাশিয়ায় শ্রমিক মা-দের প্রতি কী অমানুষিক ব্যবহার করা হতো! শ্রমিক নারী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার কথা প্রাণপণে গোপন রাখত; যতক্ষণ না যন্ত্রণায় একেবারে পাগল হয়ে যায় ততক্ষণ বাধ্য হতো কাজের নির্যাতন সহ্য করতে আর অনেক সময় তারা কর্মক্ষেত্রেই প্রসব করে ফেলতে বাধ্য হতো। নিজের সন্তানকে মা চায় না এর চেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার আর কী হতে পারে? তবু অনেক শ্রমিক নারীই বাধ্য হতো নিজের সন্তানকে অভিশাপ দিতে। শ্রমিক নারীর পক্ষে প্রসবের সময় চিকিৎসকের কাছ থেকে সামান্যতম সাহায্য পাওয়ার আশা করাটাই ছিল উদ্ভট কল্পনা, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বিশ্রাম তো দূরের কথা অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার কথাও উঠত না। সন্তান জন্মানোর পর তাকে কী করে মানুষ করতে হবে, এ-চিন্তা করার অবসর ভাবী মায়ের পক্ষে কমই ছিল। কেননা তখন এর চেয়ে ঢের বড় দুশ্চিন্তা; অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাটার কথা জানাজানি হয়ে গেলে চাকরি যাবে আর চাকরি গেলে প্রসবের দিন পর্যন্ত নিছক বেঁচে থাকার জন্যে যে দুমুঠো খাবার না হলেই নয় সেটুকু খাবারই বা জুটবে কোথা থেকে?

বাস্তবে অধিকাংশ শ্রমিক-সন্তান পথে বড় হতো। পারিবারিক জীবন বলতে এসব শ্রমিক-শিশুরা কিছুই জানত না, উপরন্তু বাবা-মায়ের কম আয়

১. নারী, পুরুষ ও সমাজ—আনু মুহাম্মদ

ও পরিবারের এই অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা কখনও কখনও মাত্র বছর দশেক বয়সেই শিশুকে একজন শ্রমিক হয়ে উঠতে বাধ্য করত। বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যেক শিশুর দায়িত্ব নিলো। ১৯২০ সালেই একেবারে খুব ছোট বাচ্চাদের জন্য শিশু হোম-কিন্ডারগার্টেন, শিশু কলোনি-হাসপাতাল এবং অসুস্থ শিশুদের জন্য রিসর্ট-রেস্টুরেন্ট, স্কুলেই বিনামূল্যে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা, বিনামূল্যে পাঠ্যবই বিতরণ, স্কুলছাত্রদের শীতবস্ত্র এবং জুতা



ছোট শিশুরা শিশু-হোমে খাবার খাচ্ছে

দেওয়ার ব্যবস্থা করল। শ্রমজীবী-কর্মজীবী নারীদের সবেতন মাতৃত্বকালীন ছুটি, প্রসূতি ভাতা, ডাবল রেশন, ছুটির পর কাজে ফেরার নিশ্চয়তা দিলো। শিশুর দায়িত্ব ক্রমেই পরিবার থেকে সমষ্টির দিকে চালিত হতে থাকল।

সোভিয়েত দেশের নারীরা মাতৃত্বের দরুন কি কি অধিকার পেত তা দেখলে তৎকালীন সময়ে যেকোনো দেশের নারীর জন্যই রূপকথার গল্প বলে মনে হতো। কতকগুলো নমুনা এমন—

১। সোভিয়েত দেশে শহর এবং গ্রাম অঞ্চলের প্রত্যেকটি এলাকায় মাতৃকল্যাণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এই কেন্দ্রগুলোর কাজ ছিল প্রত্যেক ভাবী মাকে সব রকম দরকারি ব্যাপারে উপদেশ দেওয়া, অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার পুরো সময়টুকু ভাবী মার চিকিৎসা সংক্রান্ত এবং অন্যান্য সবরকম প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা। যাতে অস্বাভাবিক প্রসবের আশঙ্কা দূর হয় এবং প্রসবের সময় ভাবী মা সময়মতো প্রসূতি-হাসপাতালে ভর্তি হয় তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হতো। মনে রাখতে হবে সবই ছিল বিনামূল্যে। প্রত্যেক ভাবী মা—

(ক) ট্রামে সবার আগে ওঠার ও প্রথমে বসতে পারার অধিকার পেতেন।

(খ) বাজার করতে গিয়ে কিউ বা প্রতীক্ষমানদের লাইনকে পেরিয়ে সবার আগে জিনিসপত্র কিনতে পারতেন।

২। চাকরি থেকে পুরো বেতনে ৪ মাস ছুটি। প্রসবের আগে ২ মাস আর প্রসবের পর ২ মাস।

৩। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে মা যখন কাজে যোগ দেওয়ার উপযুক্ত হতেন, তখন তাঁর পক্ষে পুরনো কাজে যোগ দেওয়ার অধিকার থাকত।

৪। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার চতুর্থ মাস থেকে কোনো নারীকে ওভার টাইম নিযুক্ত করা হতো না এবং প্রসবের পর শিশু যতদিন স্তন্যপান করত ততদিন পর্যন্ত —

(ক) প্রত্যেক মাকে কাজের সময় প্রতি সাড়ে তিন ঘণ্টা অন্তর শিশুকে স্তন্যদান করার জন্যে আধঘণ্টা ছুটি দেওয়া হতো।

(খ) কোনো মাকেই রাতের শিফট-এ কাজে নিযুক্ত করা হতো না।

৫। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার ষষ্ঠ মাস থেকে এবং প্রসবের পর চার মাস পর্যন্ত নারীকে সাধারণ রেশনের তুলনায় দ্বিগুণ পরিমাণ রেশন দেওয়া হতো।

৬। শিশুর জামাকাপড় কেনার জন্যে প্রত্যেক মা সরকারের কাছ থেকে নগদ টাকা পেতেন।

৭। শিশুর বয়স যতদিন না এক বছর হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত, তার খাওয়া-দাওয়ার জন্যে প্রত্যেক মা নগদ সরকারি সাহায্য পেতেন।

৮। দুমাস বয়স থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুকে পালন করার জন্যে শিশুপালন কেন্দ্রে ভর্তি করে দেওয়ার অধিকার ছিল প্রত্যেক সোভিয়েত মা-র, আর সোভিয়েত দেশে শিশুপালন কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতেই ছিল প্রকৃত সুব্যবস্থা।

মাসিক বরাদ্দের টাকাটা পাওয়া যেত শিশু দুবছরে পড়ার সময় থেকে পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত।

গণিকাবৃত্তি উচ্ছেদ

জারের রাশিয়াতে নাগরিকদের জন্য এক ধরনের পরিচয়পত্র চালু ছিল, প্রত্যেক নাগরিক যদি রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা পেতে চায় তাহলে এটা থাকা বাধ্যতামূলক ছিল। এই পরিচয়পত্র ছাড়া যাতায়াতও নিরাপদ ছিল

না। তাই এই ছোট্ট কার্ডটি একটি মূল্যবান চিহ্ন বলে পরিগণিত হতো, যেন সেদেশে বাস করার জন্য একধরনের পাসপোর্ট। কিন্তু সেদেশে কেউ যদি গণিকাবৃত্তি গ্রহণ করে তবে তাকে নাগরিক-কার্ডটি সমর্পণ করে একটি হলুদ-কার্ডের জন্য আবেদন করতে হতো। এই হলুদ-কার্ডটি পুলিশই প্রকাশ্যে বিতরণ করত। এটা হলো আইনসম্মতভাবে পুলিশের ছত্রছায়ায় থেকে গণিকাবৃত্তি চালিয়ে যাওয়ার এক ধরনের পাসপোর্ট—হলুদ-কার্ড। একই সঙ্গে এই কার্ডের মালিক মহিলাটি অন্যান্য নাগরিক সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে পারত না, বঞ্চিত থাকত। আরো ভয়াবহ বিষয় হলো, একবার যে হলুদ-কার্ড পেয়েছে সে সারাজীবনের জন্য গণিকাবৃত্তি চালাতে বাধ্য থাকত। এর থেকে বাঁচার উপায় ছিল না। একজন নাগরিক, নাগরিক-কার্ড থেকে সহজেই হলুদ-কার্ড পেতে পারত, কিন্তু একবার হলুদ কার্ড পেলে সারাজীবন আর মন পরিবর্তন করে নাগরিক কার্ড পেতে পারত না। আর নাগরিক কার্ড না পেলে কাজও জুটত না।

১৯১৩ সালে শুধুমাত্র পিটার্সবার্গে ৬০ হাজার গণিকা ছিল। এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছিল মাদকাসক্তি। দশ বছরের মধ্যে কিশোর-অপরাধীর সংখ্যা হলো দ্বিগুণ। বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্ব মুহূর্তে প্রতি ১০ জন গণিকার মধ্যে ৮ জনই ছিল অল্প বয়স্ক—২১ বছরের নিচে যাদের বয়স। গড়ে ১৬ বছর, এমনকি ১৪ বছরের বালিকারা গণিকাবৃত্তিতে নামতে বাধ্য হচ্ছিল। এই বাস্তবতা কেবল জারের রাশিয়ার ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সমাজ-ইতিহাস বলে, অবক্ষয় যত বাড়ে, শিকারের বয়স তত কমে।

রুশ সাম্রাজ্যের ট্যাক্সের বহু টাকা উপার্জিত হতো এই গণিকাদের কাছ থেকে। তাই একে নিয়ন্ত্রণ করা বা কমানোর কোনো চেষ্টার প্রতিই তাদের আগ্রহ ছিল না। নানাভাবে এই ব্যবসা চালু থাকার জন্য রাজকোষে বহু অর্থের যোগান হতো। জারতন্ত্র ভাবত যে এতে একদিকে যেমন আইনি পথেই সরকারের অর্থ আদায় হচ্ছে, অপরদিকে 'হলুদ-কার্ড' চালু করে চিহ্নিত কিছু সংখ্যকের মধ্যে পাপপ্রথাটা নিয়ন্ত্রিত রেখে 'ভদ্রঘরের সন্তানদের' এই অনৈতিকতার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থাটাই ভালো।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব রাশিয়াতে জারতন্ত্রের এসব আইনি নিপীড়ন ও অমানবিকতার বিরুদ্ধে প্রবল ধাক্কা দিলো। শত শত বছর ধরে নারীদের উপর বল্গাহীন অত্যাচারের এই অধ্যায়টিকে তারা জোর ধাক্কায় অপসারিত করল। বিপ্লবের প্রথম দিন থেকেই সাম্যবাদী নেতৃত্ব ঘোষণা

করল—'যে সমাজ তার মানুষকে মুক্তি দিতে চায় সে কখনোই এমন একটা নৈতিকতার উপর দাঁড়াতেই পারে না যা অগণিত নারীকে দাসত্বে আবদ্ধ রাখে।' সর্বত্রই 'হলুদ-কার্ড' তুলে দেওয়া হলো। গণিকাদের কাছ থেকে সরকারি ট্যাক্স আদায় বন্ধ হলো। গণিকাবৃত্তির অবসানের আন্দোলনে মুখ্যভূমিকা নিলো গরিব শ্রমিক ও কৃষক। কারণ এদের ঘর থেকেই আসত বেশির ভাগ মেয়েরা। অভাবে, দুর্দশায়, নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে বাঁচার পথ খুঁজতে এরাই বেশি সংখ্যায় বেরিয়ে আসত পরিবার থেকে। ফলে হলুদ কার্ড তুলে দিয়ে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিলো তারা। এবার প্রশ্ন—পুনর্বাসন।

পাপাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামটাকে সোভিয়েত রাশিয়া কখনোই গণিকাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরিণত করেনি। তাদের কাছে এটা ছিল গোটা সমাজের একটা সমস্যা। সংগঠিত পাপাচারের সমস্যাটার মূলে রয়েছে দারিদ্র্য এবং এক শ্রেণির মানুষের লাভজনক ব্যবসা। তাই ম্যাক্সিম গোর্কি সোভিয়েত-নীতিকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'যেদিন পৃথিবীতে একজন দাসও থাকবে না, লাঞ্ছিত-নিপীড়িত থাকবে না, সেদিনই পৃথিবী হবে ভালো পৃথিবী। আমরা যদি চাই লাঞ্ছিত-নিপীড়িত-দাসমুক্ত পৃথিবী, তাহলে আমাদের অবশ্যই লড়তে হবে সেইসব মানুষের বিরুদ্ধে যারা মানুষকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে ব্যাবসা করে।'[১] ১৯২৫ সালে সোভিয়েত সরকার ডিক্রি জারি করল—'দেহব্যাবসার বিরুদ্ধে সংগ্রামের কর্মসূচি'। এই ডিক্রিতে সমস্ত কো-অপারেটিভ ও সরকারি প্রতিষ্ঠানকে জরুরি ভিত্তিতে কতগুলো পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেওয়া হলো—

১। দেহপেশায় লিপ্ত নারীদের বেতনসহ উপযুক্ত কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।

২। তাদের থাকার জন্য বাড়ি-ঘর বানিয়ে দিতে হবে। দেখতে হবে কর্মস্থল বাড়ি থেকে যেন বেশি দূরে না থাকে।

৩। যারা চাইবে, তাদের নানা বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। সন্তানসন্ততিদের আলাদা করে চিহ্নিত না করে সাধারণ স্কুলে পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

৫। যেসব ব্যক্তি (প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে) পাপ-ব্যবসা চালাবেন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

৬। রোগাক্রান্তদের সবরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে ইত্যাদি।

১. সমাজ বিজ্ঞান ও পাপ—ডাইসন কার্টার

বলাবাহুল্য, তারা একদিনেই সাফল্যের মুখ দেখতে পাননি। খানিকটা সময় তো লেগেছিল। কারণ, এর পেছনে আরো একটি শত্রু রয়েছে, তাহলো জারের আমলে গড়ে ওঠা প্রশাসনের ওপর মহল থেকে পুলিশসহ সুবিশাল পাপ-চক্র এবং মানুষের স্থূল ভোগবাদী মনোভাব। ফলে দেহব্যাবসার বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম কর্মসূচিকে সফল করতে তাদের অনবরত চেষ্টা চালাতে হয়েছে। বার বার পুলিশ-প্রশাসনিক নির্দেশ বের করে, এক কথায় অবিরাম লেগে থেকে এইসব নির্দেশ কার্যকরী করতে হয়েছে। যে প্রচণ্ড দৃঢ়তা নিয়ে তারা এই কাজে নিয়োজিত ছিল এবং বিরামহীন চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে তার পেছনে ছিল মানুষের প্রতি ভালোবাসা। গণিকাদের তারা পাপী হিসেবে দেখেনি, দেখেছে মানুষ হিসেবে, সোভিয়েতের সাথী হিসেবে। অর্থনৈতিক পুনর্বাসন প্রচেষ্টা ছাপিয়ে উঠেছে এই ধরনের উন্নত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। এমনকি যখন কোনো গণিকালয়ে 'রেইড' হয়েছে, তখন মহিলাদের মানুষ হিসেবে, ভদ্রমহিলা হিসেবে দেখা হয়েছে, পাপ-ব্যবসার দালাল-ব্যবসায়ীদের হাতে নিগৃহীতা লাঞ্ছিতা নারী হিসেবে দেখা হয়েছে। এবং মহিলা যতই গালি দিক না কেন প্রত্যুত্তরে তার প্রতি ভদ্রভাষায় কথা বলার নির্দেশ ছিল; কখনো কোনো একটিও অশালীন ভাষা যেন প্রয়োগ না করা হয় এটাও নিশ্চিত করা হতো।

এসব যেন গল্পের মতোই মনে হয়। এসব শুনে যেকোনো দেশের পুলিশ অফিসারই অবাক হবেন। কারণ তারা তো ওই মহিলাদের নিচু শ্রেণির জীব বলে মনে করে থাকে। গাল না দিয়ে তাদের আবার সম্ভাষণ করা যায় নাকি? সেদেশেও প্রথমদিকে বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারের মধ্যে এরকম মনোভাব ছিল। কিন্তু যখন মিলিশিয়ার সঙ্গে ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সংগঠন এগিয়ে এলো, জনসাধারণও এগিয়ে আসতে থাকল তখন ওই বৈরিভাবটা মিলিয়ে যেতে থাকল। তারাও বুঝল যে এতকাল কেবলমাত্র দারিদ্র্য, কর্মসংস্থানের অভাব আর মুনাফাবাজ দালালচক্রের ফলেই সমাজে এই পাপ-প্রথা টিকে ছিল।

সোভিয়েত রাশিয়ায় এই 'পাপ-বিদায়' অভিযান বিনা বাধায় এগোতে পারেনি। যেইমাত্র সোভিয়েত সরকার পাপের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করলেন, হইচই তুলে দিলেন পাপ-ব্যবসায়ীরা। ব্রোথেল-মালিক ও এই ব্যাবসার 'ওস্তাদ ও শাহেন্‌শা'দের জেলে পুরে দেওয়া হতে থাকল। আর সাথে সাথে পত্রিকাগুলোতে অনবরত চিঠি আসতে থাকল—

'সম্পাদকের কাছে খোলা চিঠি'তে কেউ লিখল—'গণিকাদের নির্দোষ মালিকদের ধরে ধরে জেলে পাঠানো খুব অন্যায় কাজ হচ্ছে।' কেউ লিখল—'ছিঃ ছিঃ, শেষ পর্যন্ত কিনা বারবনিতাদের সমাজে ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে! এত বড় অন্যায়, অসভ্যতা কি সহ্য করা যায়!' যত অভিযান চলল, ততোই আতঙ্কগ্রস্ত প্রতিবাদপত্র বাড়তে থাকল। অন্যান্য দেশেও যেমন করে জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য 'আইনগত' ও 'ধর্মীয়'-ঢাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে তেমন করেই জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য অনবরত চিঠি আসতে থাকল। কিন্তু সোভিয়েত সরকার এক ইঞ্চিও পিছু হঠল না। মিলিশিয়া বাহিনী কঠোরভাবেই তাদের অভিযান চালাতে থাকল। পাপ-ব্যবসায়ীরা অভিযোগ তুলল—বাড়ির মালিক, হোটেল-মালিকদের অন্যায়ভাবে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র বিভাগ উত্তর দিলো, কোনো সভ্যসমাজই তার কোনো সদস্যকে, সংগঠিত পাপ-ব্যাবসা চালানোর মতো একটি নোংরা ও অপরাধমূলক কাজ চালাতে অধিকার বা বিন্দুমাত্র সাহায্য দিতে পারে না। ওরা প্রশ্ন তুলল, গণিকাবৃত্তি তো একটা বৃত্তিমূলক কাজ (প্রফেশন বা পেশা), এটা তাদের অধিকার; উত্তরে সরকার বলল, গণিকাবৃত্তি হলো দুস্থ নারীদের কাঁধে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে তাদেরকে ভোগের শিকার বানানোর একটি পাপ, যে পাপে নারীদের জোর করে বাধ্য করা হয়েছে, আর তাই সমাজের কর্তব্য হলো তাদের মুক্ত করে নিরাপত্তা দিয়ে সম্মানজনক কাজে নিযুক্ত করা।

১৯২৬ সালে একটি নতুন বিষয় সামনে উঠে এলো। মস্কোর পত্রিকা 'ইজভেস্তিয়া' তার সম্পাদকীয় কলামে লিখল, পাপটাকে তো ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছো, কিন্তু সে আর ফিরবে না? কথাটা কি ভেবে দেখেছো? যদি চাও যে বিদেয়-হওয়া পাপটা যেন আর না ফেরে, তাহলে সকল নারীরই কাজের বন্দোবস্ত করতে হবে। আর আরো একটি বিষয়ও দেখতে হবে—সেটা হলো, নৈতিকতার প্রশ্ন। পুরুষদের নৈতিকতার প্রশ্নে উন্নত জায়গায় নিয়ে যেতে হবে। সহজ ভাষায়, 'অভিযানটা খদ্দেরদের দিকে চালিত করে দিলো।' ইজভেস্তিয়া লিখল, 'যে নাগরিক নারীদের শোষণ করে সে তো একজন সন্ত্রাসী। আর যে পুরুষ অর্থ দিয়ে নারীদের মর্যাদা ধ্বংস করে সেবা আদায় করে সে তো আরো বড় সন্ত্রাসী।'

সোভিয়েত সরকার বলল, 'পুরুষদের ভেবে দেখতে হবে যে তারা ঐ খারাপ কাজে নিজেদের মর্যাদাও নষ্ট করেছেন। সমাজ ভালোবাসার পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছে। আইনত, সামাজিক, রাজনৈতিক সমস্ত রকম অধিকারে

সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। অর্থনৈতিক দাসত্ব থেকেও মুক্তি দিয়েছে। এই মুক্ত আবহাওয়ায় তাদের অর্থ দিয়ে পরিতৃপ্তি খুঁজতে হবে কেন—যা তাদের ও নারীদের উভয়কেই অমর্যাদার পাঁকে ডুবিয়ে দেয়?' ইজভেস্তিয়া সম্পাদক লিখলেন, 'আমরা এটাকে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন একটা নৈতিকতার প্রশ্ন মনে করি না। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রটাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মানুষের উপর মানুষের সর্বপ্রকার শোষণের অবসানের ভিত্তিতে। তাই যদি কোনো নাগরিক নারীদের প্রতি এই ঘৃণ্য শোষণ চালায় তবে সে নিজেকে সোভিয়েত সমাজের সদস্য বলে দাবি করতে পারে না।'[১]

এরপর ডিক্রি জারি হলো। সেই ডিক্রি অনুযায়ী মিলিশিয়া বাহিনী কাজও করে দেখাল। যখন 'রেইড'-এর পর কোথাও কেউ ধরা পড়ল, তখন সেই পুরুষদের রাতে কিছুই করা হলো না, গ্রেপ্তারও করা হলো না। পরের দিন সকালে, উন্মুক্ত স্থানে বড় করে পোস্টার টাঙিয়ে দেওয়া হলো। তাতে বড় বড় করে লেখা থাকল তাদের নাম, যারা 'খদ্দের' হিসেবে ধরা পড়েছিল। সেই তালিকার উপরে লিখে দেওয়া হলো—'এরা নারীর শরীর টাকা দিয়ে কিনেছেন।'

এই নতুন ডিক্রি অভাবনীয় কাজ করেছিল! অন্যান্য দেশে কী হয়, পুলিশ যদিও মানে যে 'ভদ্রলোকটি' অসভ্যতা-ইতরামি করে, প্রশ্রয়দাতাও বটে, তা সত্ত্বেও তার সাথে 'ভদ্রলোক' বলে সম্মানজনক আচরণ করে এবং তার অন্যায় কাজ গোপন রাখে। সোভিয়েতের এই ডিক্রিটি তথাকথিত ভদ্রলোকদের লজ্জাবোধের আবরণটুকুকে অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে পাপ বিদায় করেছিল। এক ধাক্কায় তারা ব্যক্তির নিজস্ব বিবেকবোধকে জনগণের হাজার চোখের নজরদারির সামনে নিয়ে এসেছিল। পাপকে ক্রমাগত ভর্ৎসনা করা বা শুধুমাত্র নৈতিকতার বুলি আওড়ানোর পরিবর্তে সোভিয়েত সরকার এমন ব্যবস্থা নিয়েছিল যে পুরুষদের পক্ষে ভণ্ডামি করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল।

লক্ষণীয় দিক হলো, সোভিয়েত মনস্তত্ত্ববিদরা এই ধরনের ভণ্ডামি 'নিধনযজ্ঞে' হাত দেওয়ার আগে দিনক্ষণ সতর্ক ও সঠিকভাবেই নির্বাচন করেছিল। যতদিন না ডিক্রি জারি করে ঐ সংগঠিত পাপের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও অপরাধদমন সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলো নেওয়া হয়েছিল, ততদিন তারা অপেক্ষা করেছে। সেইসব ব্যবস্থা নেওয়ার পরই পুরুষদের বিরুদ্ধে এই মনস্তাত্ত্বিক অভিযান চালানো হয়েছিল। পাশাপাশি তারা শিক্ষা ও সচেতনমূলক নাটক মঞ্চস্থ করে সর্বত্র দেখাতো। একটি নাটকে দেখানো

১. সমাজ বিজ্ঞান ও পাপ—ডাইসন কার্টার

হতো, সবশেষে, একজন নারী, একজন পুরুষ খদ্দের, একজন বাড়িওয়ালার বিচার হলো। বাড়িওয়ালাকে জেলে পাঠানো হলো, নারীকে মুক্তি দেওয়া হলো। আর পুরুষ খদ্দেরকে যাবজ্জীবন জেলে পাঠানো হলো। কারণ তার অপরাধ সবচেয়ে বেশি, সে নিজের মর্যাদা নষ্ট করেছে, নারীর মর্যাদা ধ্বংস করেছে এবং জাতির নীতি-নৈতিকতায় কলঙ্ক লেপন করেছে। নাটক দেখে যারা ঘরে ফিরেছে তারা বুঝেছে এসব কাজে লিপ্ত হলে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী এবং সবাই তাকে ঘৃণার সঙ্গে চিহ্নিত করে বলবে—'এ ব্যাটা নারীর শরীর কিনেছে।'

সোভিয়েত ইউনিয়ন একদিকে আইনি ব্যবস্থা ও অন্যান্য সরকারি পদক্ষেপ নিয়ে দেহব্যাবসা উচ্ছেদ করে, ব্রোথেল মালিক-দালাল-খদ্দেরদের শাস্তি দেয়, নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, অপরদিকে নৈতিকতার মানকে উন্নত করে—এই দুইয়ের পাশাপাশি রোগাক্রান্তদের মধ্যে বিনামূল্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে। তার ফলে ১৯৩১ সালের মধ্যে তারা সমাজজীবন, সৈন্যবাহিনী—সর্বত্র এই পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিল।

শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক উৎকর্ষতা

জারের আমলে শতকরা সত্তরভাগ লোক এক অক্ষর লিখতে-পড়তে জানত না। মেয়েদের অশিক্ষার হার ছিল আরও বেশি। নারীদের শিক্ষা গ্রহণ করাকে নানাভাবে নিরুৎসাহিত করা হতো। শিক্ষা ছিল ব্যয়বহুল। ফলে ধনী পরিবার ছাড়া ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করানো কঠিন ছিল। বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নে শিক্ষা সর্বজনীন ও অবৈতনিক করা হলো। কলকারখানায় ও যৌথ খামারে শ্রমিক-কৃষক নারী-পুরুষদের জন্য বিদ্যালয় চালু হলো। সমাজের অভুক্ত, অশিক্ষিত কিশোর-কিশোরীদের ডাক এলো শিক্ষালয় থেকে। কেবলমাত্র পয়সাওয়ালা লোকদের ছেলেমেয়েই নয়, সাধারণ কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সমাজের



১৯৩১ সালে রাশিয়ার একটি গ্রামে নারী কৃষকদের নিয়ে ক্লাস চলছে।

আঙিনা থেকে হাজার হাজার শিক্ষা-গ্রহণেচ্ছু ছেলেমেয়েরা জড়ো হলো স্কুলের আশেপাশে। সাধারণ শিক্ষালয়ের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠল বিশেষ রকম স্কুল যেখানে কেবল চাষি-মজুরের ছেলেমেয়েরাই পড়বে। এইরকম স্কুলগুলোকে বলা হতো র‍্যাবফ্যাক (Rabfak) অর্থাৎ ওয়ার্কার্স ফ্যাকাল্টি। এখানে তিন-চার বছরের কোর্সের সাহায্যে ছাত্রছাত্রীদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব শিক্ষা দেওয়া হতো। মাত্র ১৫ বছরে ৯০ শতাংশ মানুষকে তারা শিক্ষিত করে তুলল। এত দ্রুত শিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য, রাষ্ট্রের শিক্ষা দেওয়ার অভিযানের সঙ্গে প্রয়োজন ছিল জনসাধারণের শিক্ষা গ্রহণেচ্ছু মনের মিলন। এই দুইয়ের মিলন সম্ভব হয়েছিল মার্কসবাদী জীবন দর্শনের প্রতিফলনে। শিক্ষা আর কোনো একটা শ্রেণির হাতের ক্রীড়নক বা বিলাসিতা হয়ে রইল না। শিক্ষা হয়ে দাঁড়াল জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজনের একটা অঙ্গ। সোভিয়েত রাশিয়ায় শিশু-শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার মধ্যেই সমস্ত শিক্ষা-আন্দোলন সমাপ্তি লাভ করেনি। সমাজের আরও গভীর তলদেশে, আরও ব্যাপক বিস্তৃতি নিয়ে সোভিয়েত সংস্কৃতির প্রবাহ অগ্রসর হয়ে চলেছিল। তার ব্যাপ্তি দেখা যায় শহরের ও গ্রামের হাজার হাজার ক্লাবের মধ্যে।

শিল্পাঞ্চলে, যৌথ খামারে, শহরে, জনসংখ্যার প্রয়োজন অনুযায়ী হাজার হাজার ক্লাব সমস্ত দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছিল। কোথাও সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি কেন্দ্র, কোথাও শ্রমিক সংঘ ক্লাব, আবার কোথাও যৌথ খামার ক্লাব। এই সব ক্লাবে একটা করে অত্যন্ত সুসজ্জিত পাঠাগার ছিল। এখানে এসে লোকেরা মনোযোগের সঙ্গে পড়াশোনা করত—নিজেদের দেশের নানান খবর আহরণ করত, আলোচনা করত, পারস্পরিক আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া করত। এই ক্লাবগুলো আবার শিল্পকলা ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অনেকগুলো চক্র পরিচালনা করত, যেমন সঙ্গীত চক্র, কবিতা চক্র, চিত্রকলা চক্র, জীববিদ্যা চক্র, প্রত্নতত্ত্ব চক্র, স্থাপত্যবিদ্যা চক্র, এমনি আরও অনেক। শুধু ক্লাবেই নয়, কলকারখানাতেও এমনি অনেক চক্র গড়ে উঠেছিল। এই চক্রগুলোর মধ্যে নারীদের অত্যন্ত সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। সৃজনীশক্তি, কল্পনাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে নারীরাও দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্রের দিক থেকে ছেলে ও মেয়ে শিশুর মধ্যে বা নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকারের দিক থেকে কোনো পার্থক্য ছিল না। তার প্রতিফলন দেখা গিয়েছিল সকল ক্ষেত্রে। শিক্ষা-স্বাস্থ্য-খেলাধুলা-কর্মক্ষেত্রসহ সকল অবস্থানেই নারীর অংশগ্রহণ ব্যাপকভাবে বেড়েছিল।



যৌথ কৃষি খামারে একজন নারী কৃষক ট্রাক্টর চালাচ্ছেন

যৌথ খামারে নারী

বিপ্লবের পর মাত্র ২০ বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমস্ত দিক থেকে উন্নতি করে বিশ্ববাসীকে অভিভূত করেছিল। এটা কোনো ম্যাজিক ছিল না। যখন একটি রাষ্ট্র মুনাফার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় না তখন সেই রাষ্ট্র অনেক নতুন নতুনভাবে জনগণকে সম্পৃক্ত করে মানুষের কল্যাণে তার সমস্ত শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে পারে। যেহেতু ব্যক্তিগত মুনাফা করাটা উদ্দেশ্য নয় ফলে তারা জমির আলগুলোকে তুলে ফেলল, তাতে কৃষি জমির পরিমাণ অনেক বেড়ে গেল। কৃষিক্ষেত্রকে আধুনিকীকরণ করল; পুরোনো দিনের লাঙলের পরিবর্তে ট্রাক্টর, আধুনিক ফসল মাড়াই মেশিন, সেচ মেশিন আনল। প্রত্যেক কৃষক-কৃষাণিকে তারা বাস্তব শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলল। ফলে কৃষক-কৃষাণিরা বীজ বাছাই করতে শিখল, ফসলের কোন পর্যায়ে কী করা প্রয়োজন সেগুলো জানলো—বিজ্ঞানভিত্তিকভাবে শিখলো।

১৯৩৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তদশ অধিবেশনে কমরেড স্ট্যালিন তাঁর বক্তৃতায় কৃষিসমাজের এই বিশাল পরিবর্তন এবং এক ক্ষয়িষ্ণু সমাজের ভাঙনের সাথে সাথে নতুন সমাজ গঠনের গতিছন্দের ছবি তুলে ধরে বলেছিলেন, 'আদর্শস্থানীয় গির্জা, সম্মুখপটে কুলাক (ধনী কৃষক), পাদরি ও পুলিশদের বড় বড় প্রাসাদ ও পশ্চাৎ পটে

কৃষকদের আধ-ভাঙা জরাজীর্ণ কুঁড়ে-ঘর পরিবেষ্টিত পুরোনো গ্রামগুলো ক্রমে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। তার জায়গায় গড়ে উঠছে নতুন গ্রাম, বড় বড় বাড়ি, ক্লাব, বেতার, চলচ্চিত্র, স্কুল, গ্রন্থাগার ও শিশুসদন, ট্রাক্টর, কম্‌বাইন, মাড়াইকল ও অন্যান্য যন্ত্র। গ্রামের একসময়কার নামকরা প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি, শোষণকারী কুলাক, রক্তশোষক মহাজন, মুনাফাখোর ব্যবসায়ী ও 'ক্ষুদে বাপ' পুলিশরা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। যৌথ খামার, সরকারি খামার,



যৌথ কৃষি খামারে একদল নারী কৃষক

স্কুল ও ক্লাবের নেতৃস্থানীয় কর্মী, ট্রাক্টর ও কম্‌বাইনের প্রধান চালক, গো-মেষ পালন কেন্দ্রের কর্মী ও যৌথ খামারের পরিচালক 'শক-ওয়ার্কার'-এখন এরাই হলো গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি।'[১]

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার শেষে ১৯৩৮ সালে শতকরা প্রায় ৯৯.৩ ভাগ কৃষিক্ষেত্র যৌথ খামারের অন্তর্ভুক্ত হলো। ট্রাক্টর, কমবাইন, মাড়াই কল, ডায়নামো ও যানবাহনের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল প্রত্যেকটি গ্রাম। কৃষিক্ষেত্রের সমবায়ীকরণ নারীদের জীবনেও এক ব্যাপক পরিবর্তন আনল। শিক্ষার কারণে কুসংস্কার দূর হলো। বিপ্লবের আগে কৃষকেরা ভাবত নারীরা মাঠে নামলে ফসল হবে না, জমি বন্ধ্যা হয়ে যাবে; বিপ্লবের পর ১০ বছরের মধ্যে নারীরা শুধু মাঠেই নামল না, ট্রাক্টর-কম্‌বাইনের মতো জটিল যন্ত্র চালালো এবং যৌথ খামারের পরিচালক পদে নিযুক্ত হলো।

নারীদের যৌথ খামারে যুক্ত হওয়ার সকল প্রকার অর্থনৈতিক, বস্তুগত ও সাংস্কৃতিক বাধা দূর করা হলো। ফসলের মৌসুমে যৌথ রান্নাঘর, শিশুযত্ন কেন্দ্র নির্মাণ, যৌথ খামারে মেডিকেল ক্যাম্প, সম-মজুরি বা ফসলের সমভাগ,

১. সোভিয়েতের মেয়েরা—কল্যানী রায়

সম্পত্তির ক্ষেত্রেও নারীর সম-হিস্যা এসকল কারণে নারীরা ব্যাপকমাত্রায় যৌথ খামারে যুক্ত হলো। সোভিয়েত রাশিয়ায় ১৯৩৮ সালে এক কোটি নব্বই লাখ কৃষক নারী এক বিরাট সামাজিক শক্তি হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। এই নারীদের সম্বন্ধে কমরেড স্ট্যালিন বলেছিলেন, 'যৌথ কৃষিকাজ নারীজাতিকে মুক্ত করে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তার অধিকার দিয়েছে। আজ আর সে মেয়ে হিসেবে তার বাপের জন্যে বা স্ত্রী হিসেবে তার স্বামীর জন্যে কাজ করছে না, সে কাজ করছে সর্বাগ্রে তার নিজের জন্যে। এই হলো কৃষক -নারীদের মুক্তির গোড়ার কথা। এই হলো যৌথ কৃষিব্যবস্থার মূলতত্ত্ব যা একজন নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান জায়গায় দাঁড়ানোর অধিকার দিয়েছে।'[১]

নারী শ্রমিকদের নতুন জীবন

অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশের তুলনায় জারের আমলে রাশিয়ায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। পুরুষদের চেয়ে নারীদের অত্যন্ত অল্প মজুরিতে পাওয়া যেত বলে পুঁজিপতি মিল-মালিকরা তখন নারীদেরকে কলকারখানায়



নারীরা কারখানাতে রেডিও তৈরি করছেন।

কাজ দিত। ১৯১৩ সালে সমস্ত রুশ দেশে নারী শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ছিল ৬ লাখ ৩৬ হাজার। আর বেশির ভাগ নারী শ্রমিকই হলো কাপড়ের কলের, যেখানে দুর্দশা ও খাটুনির অন্ত ছিল না। ১৯১৪ সাল থেকে আরম্ভ হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। পুরুষরা চলে গেল মাঠে লড়াই-এর সৈন্য হয়ে। নারীরা গিয়ে জমল কলকারখানায়। ছয় লাখ ছত্রিশ হাজার থেকে আট লাখ আশি হাজারে গিয়ে দাঁড়াল নারী শ্রমিকের সংখ্যা। সংখ্যা বাড়ল কিন্তু দুর্দশা ঘুচল না এতটুকুও। মজুরি কমল, কাজের ঘণ্টা বাড়ল; খাদ্যদ্রব্যের সংকট হলো, সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ল অন্যান্য জিনিসপত্রের দাম।

---

১. সোভিয়েতের মেয়েরা—কল্যানী রায়

বিপ্লবের পর অর্থনীতির পুঁজিবাদী রূপ পাল্টে গেল। শ্রমিকদের এবং সমস্ত মানুষের জীবনের বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পেছনে এটাই ছিল মূল কথা। যে উৎপাদন-যন্ত্র সমস্ত দেশের গতি ও প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল তার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের হস্তান্তর ঘটল। মুষ্টিমেয় কলমালিকদের হাত থেকে সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্র চলে এলো শ্রমিকদের হাতে—যারা হলো যন্ত্রের প্রকৃত চালক। সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন আর কারখানার মালিক কোনো পুঁজিপতি নয়—সকল শ্রমিক ঐ কারখানার মালিক। ফলে দেশের ব্যাপক জনগণ সম্পৃক্ত হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেল।

১৯১৭ থেকে ১৯৪৬ সাল—এই ২৯ বছরে সমস্ত সোভিয়েত দেশের শ্রমশিল্পের ধারা আগাগোড়া পাল্টে গিয়েছিল। পুরনোকালের ছোট ছোট হস্তচালিত যন্ত্রগুলো উঠে গিয়ে বসেছিল নতুন নতুন বৈদ্যুতিক যন্ত্র। যে সোভিয়েত দেশ বিপ্লবের অব্যবহিত পর পর্যন্ত বড় বড় যন্ত্রের জন্যে বিদেশের দিকে তাকিয়ে ছিল, সেই সোভিয়েত দেশেই তৈরি হচ্ছিল সমস্ত রকম ভারি ভারি যন্ত্র। সেই বিশ বছর আগেকার অশিক্ষিত, অভুক্ত ও আনাড়ি শ্রমিকরাই যন্ত্র জগতে এনেছিল এই বিপ্লব। সেটা করতে গিয়ে তাদের নিজেদের জীবনও পাল্টে গিয়েছিল আগাগোড়া।

দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীও সেই বিপ্লবে পিছিয়ে রইল না। নারীদের কর্মক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার সকল বাধা দূর করা হলো। প্রত্যেক কাজে নারী-পুরুষের সম-মজুরি, সকল কারখানায় মেডিকেল ক্যাম্প, যৌথ রান্নাঘর, শিশুযত্ন কেন্দ্র, শিশু-বিদ্যালয়, মাতৃত্বকালীন ছুটি, ছুটি শেষে কাজ ফিরে পাওয়ার নিশ্চয়তা ইত্যাদি কারণে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ অনেকমাত্রায় বেড়ে গেল। ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে মোট ১ কোটি ১০ লাখ নারী কলকারখানা, যাতায়াত ব্যবস্থা ও নির্মাণ কাজে যুক্ত ছিলেন। এর মধ্যে ১ লাখ ৭০ হাজার ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার ও টেকনিশিয়ান।

বিপ্লব-পূর্ব যুগে যে সমস্ত নারী শ্রমিক ছিল, তাদের না ছিল শিল্পশিক্ষা, না ছিল দক্ষতা; অধিকাংশই কোনো লেখাপড়া জানত না। তারা প্রায় সবাই ছিল কাজ-না-জানা বা আধা-জানা শ্রমিক। বিপ্লবের পর প্রত্যেক কারখানায় চালু হলো শিল্পশিক্ষা কেন্দ্র। ফলে পুরুষ শ্রমিকদের পাশাপাশি ক্রমেই নারী শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়ছিল। ১৯৩৫ সালে বড় বড় কলকারখানার শ্রমিকদের যে টেকনিক্যাল পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল সেই পরীক্ষার ফলাফলেও নারী শ্রমিকরা পুরুষদের সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, কয়েকটা বিষয়ে তারা পুরুষদেরকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল। বিপ্লবের আগে একজন



১৯৪৭ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধে বিধ্বস্ত ভবন পুনর্নির্মাণ করছেন নারী শ্রমিকরা

নারীও বিদ্যুৎ উৎপাদন ঘরে কাজ করত না। কিন্তু ১৯৩৪-এ সেখানকার ফিটারদের মধ্যে শতকরা তের ভাগ এবং প্রধান সুইচবোর্ড কর্মীদের মধ্যে ৩২ ভাগ হলো নারী।

'মস্কো শহরে পরিচারিকার কাজ করত ভেরা ব্রাগিনা। তার গ্রাম ববরিকীতে নতুন কারখানা তৈরি হচ্ছে শুনে সে সেখানে কাজ নেয়। কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে সে সাধারণ শিক্ষা ও যন্ত্রবিদ্যা আয়ত্ত করার জন্যে আপ্রাণ পরিশ্রম করে। তিন বছর পরে অ্যামোনিয়া কারখানার নির্মাণকাজে তাকে স্থানান্তরিত করা হয় এবং সেখানে কমপ্রেসারের কাজ দেওয়া হয়। এই কাজ সক্রিয় 'শক ওয়ার্কারের' যোগ্যতা দেখানোর ফলে 'অর্ডার অব দি ব্যানার অব লেনিন' উপাধি উপহার দেওয়া হয় তাকে।

আইভানোভা কাপড় কলের ক্লডিয়া বুইকোভা। ১৯২৬ সালে যখন সে গ্রাম থেকে আইভানোভায় আসে তখন একেবারে অশিক্ষিত ছিল সে। লেবার এক্সচেঞ্জ তাকে পাঠিয়ে দেয় ফেলিক্স জারঝিন্স্কি কারখানায়। সেখানে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সে। ১৯২৭ সালে কাঠিম জড়ানোর কাজে তাকে স্থানান্তরিত করা হয়। কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে সাধারণ ও টেকনিক্যাল শিক্ষা গ্রহণ করে। অল্প সময়ের মধ্যে সে তার বিভাগের অধ্যক্ষ হিসেবে নিযুক্ত হয় এবং ছাব্বিশটি বিশেষ পুরস্কার লাভ করে। ইয়ং কমিউনিস্ট লীগের পঞ্চদশ বার্ষিকীতে সরকার থেকে তাকে 'অর্ডার অব দি লেনিন' উপাধি দান করা হয়।' কল্যাণী রায় ১৯৪৬ সালে প্রকাশিত তাঁর 'সোভিয়েতের মেয়েরা' বইটিতে এমন অনেক নারী শ্রমিকের জীবনের পরিবর্তনের কথা লিখেছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে আরেক্সাই স্টাখানোভ নামের এক কয়লা খনি শ্রমিককে কেন্দ্র করে উৎপাদন বৃদ্ধির 'সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা' উদ্ভাবিত হলো। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা হলো উৎপাদন বৃদ্ধির হাতিয়ার। প্রত্যেক কারখানায় কারখানায় এই প্রতিযোগিতা হতো; শ্রমিকরা যোগ দিত দলে দলে। কে সবচেয়ে বেশি উৎপাদন বাড়াতে পারে, কে কলকব্জায় উন্নতি সাধন করে যন্ত্রের গতি বাড়াতে পারে—এই নিয়ে লড়াই। পুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে নারীরাও এই প্রতিযোগিতায় অগ্রণী হয়েছিল।

সোভিয়েত শ্রমিকদের, বিশেষ করে নারী শ্রমিকদের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রধান সহায় ছিল 'শ্রমিক আইন' ও 'সামাজিক বীমাব্যবস্থা'। অসুস্থতায়, দুর্ঘটনায় বা চিরস্থায়ী পঙ্গুতায় এই বীমাব্যবস্থাই শ্রমিকদের জীবনের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করত। গর্ভাবস্থার আগে এবং পরে নারীদের এই বীমা ভাণ্ডার থেকেই অর্থ সাহায্য করা হয়। অন্যান্য দেশের মতো শ্রমিকদের মাইনে থেকে একাংশ কেটে নিয়ে এই বীমাভাণ্ডার তৈরি হতো না। সোভিয়েত শ্রমিকরা এক পয়সা দিয়েও এই বীমা ব্যবস্থাকে পুষ্ট করত না। কারখানা কমিটিই কলকারখানার অর্থ দিয়ে এই ভাণ্ডার গঠন করত। কোনো শ্রমিক মারা গেলে এই বীমা-ভাণ্ডার থেকে তার পরিবারকে সাহায্য দেওয়া হতো। নতুন সন্তান জন্মানোর পর মায়েদের প্রতি মাসে সন্তান-পালনের জন্যে অতিরিক্ত অর্থ দান করা হতো। শুধু তাই নয়, এই ভাণ্ডারের তরফ থেকে সমস্ত শ্রমিক ও তাদের পরিবার বিনামূল্যে চিকিৎসা, স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিরামাবাসে থাকার সুবিধা পেত।

সোভিয়েত ইউনিয়ন দৈনিক কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে ৭ ঘণ্টা এবং পরবর্তীতে ৬ ঘণ্টায় নামিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছিল। অন্য দেশের মতো সোভিয়েত নারী শ্রমিকদেরকে কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে জীবনপাত করতে হতো না। সোভিয়েত দেশে সবাই প্রত্যেক বছরে দু থেকে চার সপ্তাহ পর্যন্ত বেতনসহ ছুটি পেত। এই ছুটির সময়ে সবাই স্বাস্থ্য-নিবাস বা বিশ্রামগৃহে দিন কাটাত। যাওয়া-আসার ভাড়া ও সেখানে থাকার সমস্ত খরচ ঐ কারখানার শ্রমিক সংঘ বহন করত। সোভিয়েত সরকারের চেষ্টায় কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে ও ককেশাস অঞ্চলে হাজার হাজার স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রাম-গৃহ গড়ে তোলা হয়েছিল; বিপ্লবের আগে রাজা-মহারাজাদের যে সব বড় বড় প্রাসাদ ছিল এই সব অঞ্চলে, বিপ্লবের পর সেই সব প্রাসাদগুলোকে চাষি-মজুরদের স্বাস্থ্য নিবাসে পরিণত করা হয়েছিল। প্রতি বছর লাখ লাখ সোভিয়েত নাগরিক এসব জায়গায় ভ্রমণ করত এবং উৎসবের মধ্য দিয়ে দিন

কাটাত। সাপ্তাহিক ছুটি কাটানোর জন্যেও সোভিয়েত দেশে বহু One Day Rest Home ছিল। প্রত্যেক স্বাস্থ্য-নিবাস ও বিশ্রামাবাসে সারাক্ষণের ডাক্তার এবং নার্সের ব্যবস্থা ছিল।

এক বিশাল কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়ে এবং জনগণের বিপুল অংশকে যুক্ত করে পিছিয়ে পড়া দেশ থেকে ২০ বছরের মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন শিল্প-কৃষি, শিক্ষা-বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যসহ বিশ্বে এমনকি মহাকাশেও শীর্ষ পুঁজিবাদী দেশগুলোকে প্রায় অতিক্রম করে যাওয়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে গেল।

সোভিয়েত নারী : ঘর থেকে মহাকাশে

বিপ্লবের আগে ১৯০৯ সালের কথা। সে সময়ে একাটেরিনা ফ্রিশিট্জ্ নামে একজন নারী আইন পাশ করে সহকারী এটর্নির পদে সেন্ট পিটার্সবার্গ বার এসোসিয়েশনে যোগ দেয়। এই নিয়ে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয় সমস্ত রাশিয়ায়। একদিন সেই মেয়েটি আদালতে একটি ফৌজদারি আসামির পক্ষ সমর্থন করতে ওঠায় প্রসিকিউটর আপত্তি জানায়। কারণ নারী এটর্নির স্থান নাকি আদালতে হওয়া উচিত নয় এবং শেষ পর্যন্ত প্রসিকিউটরটি প্রতিবাদে ঘর ছেড়ে চলে যায়। সমস্ত ব্যাপারটি উচ্চতর পরিষদে বিচারের জন্যে পাঠানো হয়। সেখান থেকে ঘোষণা করা হয় যে ভবিষ্যতে কোনো মেয়ে আইনজ্ঞের পেশা গ্রহণ করতে পারবে না। একাটেরিনাকে বাধ্য হয়ে সে কাজ ত্যাগ করতে হয়।



ভ্যালেন্তিনা তেরোসকোভা বিশ্বের প্রথম নারী মহাকাশচারী

কিন্তু বিপ্লবের পর সোভিয়েত সমাজ নারীকে স্বাধীনতা দিয়েছে। বিপ্লবের পরের রাশিয়ায় একাটেরিনার মতো নারীরা হয়েছেন একজন অধ্যাপক, ব্যবহারবিদ্যার বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের সভ্য, মস্কো



বিমান বাহিনীতে কর্মরত কয়েকজন নারী

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক, বৈদেশিক বাণিজ্য ইনস্টিটিউটের আইন বিভাগে বড় পদাধিকারী এবং ব্যবসায়ী পরিষদের একজন সক্রিয় কর্মী।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে একজন ইংরেজ লেখক প্যাট স্লোনের অভিজ্ঞতার একটি কাহিনি। তিনি বহুবার সোভিয়েত দেশে গিয়েছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘদিন থেকে সে সমাজের সামগ্রিক রূপকে বুঝতে চেষ্টা করেছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি যখন মস্কো যান তখন একটি মেয়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। যে বাড়িতে তিনি উঠেছিলেন মেয়েটি সে বাড়িতে গৃহশ্রমিকের কাজ করত। গ্রামের মেয়ে, প্রাথমিক শিক্ষা পর্যন্ত জোটেনি তার ভাগ্যে। ১৯৩৭ সালে আবার যখন প্যাট মস্কোয় যান তখন সেই মেয়েটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয় কিন্তু মেয়েটি আর সে মেয়েটি নেই। জিজ্ঞাসু স্লোনের দিকে তাকিয়ে মেয়েটি জানিয়েছিল, গৃহশ্রমিকের কাজ সে ছেড়ে দিয়েছে। তখন সে একটি ল্যাবরেটরিতে যুক্ত আছে এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। কথা শুনে স্লোন আশ্চর্য বোধ করলেন না, কারণ তিনি তখন ধরতে পেরেছিলেন সোভিয়েত সমাজের ভিতরকার জীবনদর্শন। তিনি শুধু এইটুকুই ভাবলেন যে মেয়েটি যদি মস্কোয় না থেকে ইংল্যান্ডে থাকত তাহলে কী হতো তার ভবিষ্যৎ। গ্রামের সেই অশিক্ষিতা মেয়েটি শুধু এক মনিবের দরজা থেকে অন্য এক মনিবের দরজায় ঘুরে বেড়াত! শুধু এই মেয়েটিই নয়, এমনি হাজার হাজার নারী সমাজের নিম্ন স্তর থেকে উঠে সোভিয়েত দেশে উচ্চ স্তরে বসার সম্মান পেয়েছিল।

অক্টোবর বিপ্লব রাষ্ট্রের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে শৃঙ্খলমুক্ত করে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজে যুক্ত করেছিল। শিক্ষিতের হার বাড়া, সকল কাজে নারী-পুরুষের সম-মজুরি, সারাদেশ জুড়ে যৌথ রান্নাঘর-ভোজনালয়, ডে-কেয়ার সেন্টার, শিশু-বিদ্যালয় চালু, মাতৃত্বকালীন ছুটি, যৌথ খামার বা কৃষি ক্ষেত্রে সমবায়ীকরণ, শ্রমিকদের 'সামাজিক বীমা' এ সকল ব্যবস্থার কারণে সকল প্রকার কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ অনেক বাড়ল এবং বিপ্লবের ২০ বছরে কর্মক্ষেত্রে নারী আর পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান সমান হলো। শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল ইত্যাদি সকল ধরনের কাজে নারীরা পুরুষের প্রায় সমান অনুপাতেই যুক্ত হয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালের এক পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায়—

কাজের ধরন	মেয়ে	পুরুষ
বড় বড় শ্রমশিল্পে (১৯৩৭)	৩৯.৮%	৬০.২%
বৈজ্ঞানিক গবেষণায়	৩৪%	৬৬%
বিশ্ববিদ্যালয়ে	৪৩.১%	৫৬.৯%
চিকিৎসা-শাস্ত্রে	৫০.৬%	৪৯.৪%
শিক্ষাজগতে	৬৪.৮%	৩৫.২%

এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃষ্টিভঙ্গি বুঝা যায় কমরেড লেনিনের কথায়, 'আমরা যদি নারীদের জনহিতকর কাজে, মিলিশিয়ায়, রাজনৈতিক জীবনে টেনে না আনি, আমরা যদি মেয়েদের গৃহকাজ ও ঘরকন্নার মারাত্মক আবহাওয়া থেকে টেনে না আনি, তাহলে সত্যিকারের স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব; এমনকি গণতন্ত্র কায়েম করাও অসম্ভব, সমাজতন্ত্র তো দূরের কথা।'[১] এমন প্রচেষ্টার কারণেই দেখা যায়, পৃথিবীর প্রথম নারী মহাকাশচারী একজন রুশ, ভ্যালেন্তিনা তেরেসকোভা। তিনি ছিলেন একজন কৃষকের মেয়ে। আমাদের দেশের মতো কোনো পুঁজিবাদী দেশে কৃষকের মেয়ের মহাকাশচারী হওয়ার স্বপ্ন অলীক কল্পনা হয়েই থাকতো।

জাতীয় রিপাবলিক বা বিভিন্ন জাতিসত্তার নারীরা

ট্রান্স-ককেশাস, উজবেক, তাজিকসহ নানান জাতির মানুষ নিয়ে সোভিয়েত দেশের জনসংখ্যা। এসব জাতির মেয়েরা ছিল অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন

১. প্রবাসীর পত্র—ভ. ই. লেনিন



বিভিন্ন জাতিসত্তার নারীদের জীবনের পরিবর্তন
বিপ্লবের আগের ছবি—পারাঞ্জা পরিহিত নারী
বিপ্লবের পরের ছবি—সোভিয়েতের সর্বোচ্চ পরিষদের সদস্য হয়ে কাজ করছেন নারী

এবং রক্ষণশীল। তাই আইনের সাহয্যে তাদের চিরাচরিত রীতিনীতি উচ্ছেদ করে স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করতে হলো। জনসাধারণের কর্তৃত্ব কায়েম হওয়ার সাথে সাথে বাধ্যতামূলক বিবাহ, বলপূর্বক বিবাহ, মেয়ে-বিক্রি প্রথা আইনত উচ্ছেদ করে প্রাথমিক পর্যায়ে ন্যূনতম ষোলো বছর বয়সে মেয়েদের বিয়ে দেওয়ার আইনসঙ্গত বয়স স্থিরীকৃত হলো। খোলা হলো মেয়েদের ক্লাব। তাদের হাতের কাজ প্রদর্শিত হলো সেখানে, নানান বিষয়ের ওপর নিয়মিতভাবে শিক্ষা পেতে থাকল সবাই। ধীরে ধীরে এই ক্লাবগুলোই হয়ে উঠল হাতের কাজের সমবায় ভাণ্ডার। এই ক্লাব থেকেই সর্বপ্রথম মেয়েরা নিজেদের পরিশ্রমে একটা কারখানা গড়ে তুলল—সেইসব মেয়েরা যারা আগের দিনে ছিল হেরেমের বন্দিনি। রক্ষণশীল মুসলিম সামাজিক প্রথা যা এতদিন সমস্ত নারীসমাজকে তার নাগপাশে বেঁধে রেখেছিল, নতুন যুগের প্রবর্তনে তা ভঙ্গুর হয়ে এলো। তারপর এলো প্রথম ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা যা এই নড়বড়ে সমাজের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ভিত্তিকে কঠিন জমিনের ওপর স্থাপন করল। শিল্প ও কৃষি গড়ে উঠল, নারী বিশ্ববিদ্যালয়ে-কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করল। বারো বছর বয়স হলেই পারাঞ্জার[২] আড়ালে ঢাকা পড়ত যাদের জীবন, পরিবারের প্রত্যেকটি পুরুষ মানুষের পা ধোয়াই ছিল যাদের জীবনের ব্রত, বাড়ির খুদ-কুঁড়ো দিয়ে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে হতো যাদের, তাদের জীবনও আলোকিত হলো।

২. এক ধরনের বোরখা

সোভিয়েত নারীর অধিকার ও মর্যাদার স্বীকৃতি : কেবলমাত্র অর্থনৈতিক নয়, সাংস্কৃতিক লড়াই

'কোনো সমাজ কতটুকু সভ্য তা পরিমাপ করা যায় ঐ সমাজে নারীর অবস্থান নির্ণয় করে।' রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অনেক আগে কার্ল মার্কস সমাজে নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেছিলেন। আর সোভিয়েত সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছিল তার বাস্তব উদাহরণ। শুধু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নয়, নারী শৃঙ্খলিত ও মানবিক পরিচয় থেকে বঞ্চিত যুগ যুগ ধরে; মধ্যযুগীয় সামন্ত সমাজ নারীকে করেছে সম্পত্তি আর পুঁজিবাদ করেছে পণ্য। সোভিয়েত সমাজ নারীকে এই দুই অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে মানবিক মর্যাদা দিয়েছিল। এজন্য তাকে লড়াই করতে হয়েছিল গ্রামীণ মোড়লতন্ত্র ও জার শাসনের শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে। তাই এই লড়াই কেবল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নয়; এক সাংস্কৃতিক লড়াইও বটে। নারী পুরুষের অধীন নয়, বরং তার পাশে দাঁড়িয়ে সমানে সমান ভূমিকা পালন করতে পারে সব কিছুতেই— সোভিয়েত এই সত্যটা প্রতিষ্ঠিত করেছিল। পুরুষদেরও শিখিয়েছিল, নারীকে দুর্বল না ভেবে মানুষ হিসেবে ভাবতে; দক্ষতা বা যোগ্যতার কোনো লিঙ্গভেদ নেই; নারী-পুরুষের পার্থক্যটা প্রাকৃতিক কিন্তু বৈষম্য সামাজিক। সেই সমাজ পাল্টানোর সংগ্রামে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে এই সাংস্কৃতিক সংগ্রামও সোভিয়েতকে করতে হয়েছিল।

কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন, 'পৃথিবী যখন এগিয়ে চলে, আমরা তখন বসে/বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজি কোরান-হাদিস চষে।' সোভিয়েত সমাজ এই মোল্লাতন্ত্র, গ্রামীণ কুসংস্কার, পুরোনো সমাজের ধ্যান-ধারণা, পতিতাবৃত্তি দূর করে, অবরুদ্ধতার নিগড় থেকে বের করে এনেছিল নারীর মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক অবদান। কেবলমাত্র বেঁচে থাকার প্রয়োজনে নারী এখন শ্রমিক নয়, বরং বিকশিত এক সমাজ নির্মাণের জন্যই সে শ্রমের সাথে যুক্ত হয়েছে, শিক্ষিত হয়েছে, উৎপাদনে যুক্ত হয়েছে। নারী অনুধাবন করেছে— 'সে মানুষ'; এটাই ছিল সোভিয়েত রাষ্ট্রে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার এক মহান সাংস্কৃতিক তাৎপর্য।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর

সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে নারীর অবস্থানের সম্পর্ক যে খুব ঘনিষ্ঠ তা প্রকটভাবে প্রকাশিত হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর পুঁজির যে নতুন বিকাশ শুরু হয়, তার

ফলে জনগণের অন্যান্য অংশের চেয়েও অধিক হারে নারী তার অবস্থান, জায়গা হারানো শুরু করে। সবার মধ্যে নারীর অবস্থানই হয়ে পড়ে সবচেয়ে নাজুক; পুঁজির আক্রমণের সামনে সম্পূর্ণ বর্মহীন লক্ষ্যে পরিণত হয় নারী।

১৯৯৬ সালে রাশিয়াতে 'সোভিয়েত নারীদের কংগ্রেস' নামে একটি সংগঠন গঠিত হয়েছিল। পরিস্থিতি অনুধাবনের জন্য ওই সংগঠনের প্রথম সেক্রেটারি নাতালিয়া অ্যান্ডোয়েভার বক্তব্য এখানে প্রাসঙ্গিক—'এখন নারী-পুরুষ উভয়ের প্রকৃত মজুরি আগের তুলনায় অনেক কম। শিশু পরিচর্যায় নারীরা বিশেষভাবে আক্রান্ত। সোভিয়েত ইউনিয়ন থাকাকালে আমাদের সন্তানেরা অবৈতনিক নার্সারি, কিন্ডারগার্টেন ও ডে-কেয়ার কেন্দ্রগুলোতে যেত। আমরা কর্মরত অবস্থায় নিশ্চিত থাকতাম এই ভেবে যে, তারা এই সময়টুকুতে নিরাপদেই থাকবে। বর্তমান অবস্থায় যে নারী শ্রমিকটির শিশু সন্তান আছে সে জানে না যে সে কী করবে। সোভিয়েত ইউনিয়নে সারা দেশজুড়ে তিন মাসব্যাপী ছুটিতে শিশুরা পাইওনিয়ার ক্যাম্পে অবস্থান করত। এখন এই ক্যাম্পগুলো তুলে দেয়া হয়েছে। শিশুদের জন্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। বহুসংখ্যক শিশু পাঠাগারও ছিল যা এখন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ক্রীড়া কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, নৃত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত ও দাবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এসবই ছিল অবৈতনিক। এখন এসবই তুলে দেওয়া হয়েছে কিংবা এগুলো এখন খুবই ব্যয়বহুল। ...সোভিয়েত আমলে প্রণীত আইন অনুযায়ী রাশিয়াতে নারীরা এখনো পর্যন্ত পুরুষের সমান মজুরি পায়। কিন্তু এখন মেয়েরা গর্ভবতী হলে কিংবা শিশুর পরিচর্যার জন্য বাড়িতে অবস্থান করলে দারুণভাবে তিরস্কৃত হয়; সমাজতান্ত্রিক যুগে যা কোনোভাবেই সম্ভব হতো না। সোভিয়েত আইন একজন নারীর পূর্ণ বেতনসহ চার মাসের প্রসবকালীন ছুটি ভোগের ব্যবস্থা নিশ্চিত করত এবং তারপরও সে আরো এক বছর আংশিক বেতনসহ নিজ গৃহে অবস্থান করতে পারত। সে তিন বছরের ছুটি নিলেও তার চাকরি সংরক্ষিত থাকত। ঐ সমস্ত আইন কাগজে-কলমে এখনো লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু দিন দিন অধিক থেকে অধিকতর সংখ্যায় মেয়েরা চাকরি হারানোর হুমকির শিকার হচ্ছে। ...হয়তো আমাদের নিজেদের ইউনিয়নকে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে, কারণ যেসব ইউনিয়ন আছে, সেগুলো নারীদের অধিকারের পক্ষে দাঁড়ায় না। ...সোভিয়েত সময়ে সরকারে নারী প্রতিনিধিত্ব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর চেয়েও অনেক বেশি মাত্রায় ছিল, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় ছিল অনেক কম। নারীদের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য সংগ্রাম এখন আমাদের জন্য অধিকতর জরুরি হয়ে পড়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রয়োজনকে অকৃত্রিমভাবে

প্রতিনিধিত্ব করবে শুধু নারীরাই। ...১৯৮০-এর দশকের শেষদিক থেকে মাদকাসক্তি একটি গণসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে খাদ্যমূল্য দারুণভাবে বেড়ে গেছে, কিন্তু মদ সস্তায় বিক্রি হচ্ছে।'[১]

নারীমুক্তি আন্দোলন ও সাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠার লড়াই অবিচ্ছিন্ন

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন হয়েছে কিন্তু তাই বলে পুঁজিবাদের শোষণের চরিত্র মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি। এই সময়কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়েছে, মানুষ অধিকতর যান্ত্রিক সুবিধাদি অর্জন করেছে কিন্তু মানুষের মানবিক গুণাবলির স্বীকৃতি, মনুষ্যত্ব ইত্যাদি বাজারের পণ্যে পরিণত হয়েছে। নারীর শ্রম সস্তায় বিক্রি হয় আর দেহও পণ্যে পরিণত। কোথায় নারীমুক্তি, কোথায় শ্রমজীবী নারীর সকল ধরনের শোষণ থেকে মুক্তি! এক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীতে নারী কাজ করছে শতকরা ৬৫ ভাগ, বিপরীতে তার আয় মাত্র শতকরা দশ ভাগ। পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সংখ্যার অনুপাত প্রায় সমান হলেও দুনিয়ার মোট সম্পদের শতকরা মাত্র একভাগের মালিক নারী। নারীর সমানাধিকার এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ায় মুখ থুবড়ে পড়েছে; আর তাদের 'নারীমুক্তি'র কথা আজ শুধু বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়েছে।

পুঁজির রূপকে দেখাতে গিয়ে কার্ল মার্কস ক্যাপিটাল গ্রন্থে টি. জে. ডানিং-এর উদ্ধৃতি দিয়ে দেখিয়েছেন, 'মুনাফার সম্ভাবনা দেখলে যেখানেই বলবে পুঁজি সেখানেই খাটতে যাবে, ২০ শতাংশ লাভের নিশ্চিত আশ্বাসে তার চোখ চকচক করবে, ৫০ শতাংশ লাভের লোভে তার ঔদ্ধত্য সীমা ছাড়াবে, ১০০ ভাগ লাভ হবে জানলে সে ন্যূনতম মানবতাটুকুর গলায় পা দিয়ে দাঁড়াবে। ৩০০ ভাগ লাভ হবে এই নিশ্চয়তা পেলে হেন অপকর্ম নেই যা সে করবে না, এমনকি পুঁজির মালিকের ফাঁসি হতে পারে জেনেও পুঁজি ছুটবে লাভের অদম্য লালসায়।' তাই নারীকে নিয়ে ব্যাবসা (নারী পাচার, নারীদেহ বিক্রি, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি) করতেও এদের বাধে না। বর্তমানে সারা বিশ্বে নারী ব্যাবসা অঘোষিত দ্বিতীয় বড় ব্যাবসা। শুধুমাত্র আমেরিকায় পর্নোগ্রাফিতে যে পুঁজি বিনিয়োগ হয় তা সারাবিশ্বের শিল্প-সাহিত্য-চলচ্চিত্রে বিনিয়োজিত পুঁজির চেয়েও বেশি। আমাদের দেশেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠোপোষকতায় চলছে পতিতাবৃত্তি। নারী পাচার, মাদক, পর্নোগ্রাফির ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠছে। পণ্যের বিজ্ঞাপনে নারীকে ব্যবহার করা হচ্ছে পণ্য হিসেবে। নারী পাচারকারী, মাদক ব্যবসায়ী ইয়াবা রাজা নামে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও পাওয়া যাবে যিনি আমাদের দেশের 'মাননীয় সংসদ সদস্য'!!

১. নারী, পুরুষ ও সমাজ—আনু মুহাম্মদ

নারী-শিশু নির্যাতন-ধর্ষণ-হত্যা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। এখানেও পুঁজির দৌরাত্ম্য। নির্যাতনকারীরা অর্থ ও ক্ষমতার দাপটে পার পেয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশে প্রায় ২৭ বছর ধরে নারী প্রধানমন্ত্রী। মন্ত্রী পরিষদে, সংসদে, বিচারপতি, আইনজ্ঞ, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। কিন্তু নারী-সমাজের মর্যাদা ও অধিকার বাড়ছে না এবং তাদের উপর নেমে আসা নির্যাতনও কমছে না। কারণ গুটিকতক নারীর ক্ষমতাধর হয়ে ওঠার মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিকতা ও পুঁজিবাদী শোষণের ব্যবস্থা পাল্টে যায় না।

রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ১০০ বছর পেরিয়ে এসেছি আমরা; কিন্তু বর্তমান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের একটি দেশও প্রকৃত অর্থে সেই দেশের সকল আইনে নারীর সমান অধিকার ও মানুষ হিসেবে মর্যাদা প্রণয়ন করতে পারেনি। আমাদের দেশে সংবিধান দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো। সংবিধানে লেখা আছে 'নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সকল ক্ষেত্রে সমান অধিকার পাবে।' আইনে আছে নারী-পুরুষ সম-কাজে সমমজুরি পাবে। কিন্তু বাস্তবতা ভিন্ন। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রায় সকল খাতেই নারী কম মজুরি পেয়ে থাকেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে আইনেই নারী সমান অধিকার পান না। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে পারিবারিক জীবনে নারী এখনও সমান অধিকারই পান না। বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, সন্তানের অভিভাবকত্বের প্রশ্নে নারী বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকেন। পারিবারিকভাবে সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রশ্নেও সে কথা প্রযোজ্য।

নারীর গৃহস্থালির কাজের আর্থিক কোনো স্বীকৃতি নেই। বাংলাদেশে গৃহিণী নারীরা দিনে গড়ে প্রায় ১৬ ঘণ্টা এবং প্রায় ৪৫ ধরনের কাজ করে থাকেন। রান্না করা, কাপড় পরিষ্কার করা, ঘর গোছানো, পরিবারের শিশু ও বৃদ্ধদের যত্ন নেওয়া, অসুস্থদের দেখাশোনা করা ইত্যাদি—এত কাজের পরও সমাজে গৃহিণীর পরিচয় হয় 'তিনি কিছুই করেন না' বলে। ফলে পরিবারে তিনি নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। স্বাধীন মতামত ও আর্থিক স্বাবলম্বিতা না থাকার দরুন অনেক সময়ই নির্যাতন, অত্যাচার, লাঞ্ছনা, অবমাননার মধ্যে তাকে পতিত হতে হয়। কিন্তু এই গৃহস্থালি কাজ পরিবারে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো ছাড়া পরিবার চলে না। পুঁজিবাদ বরাবরের মতো এক্ষেত্রেও ব্যাবসা করে, মুনাফা করে এবং ধনীরাই সেই সেবাগুলো কিনতে পারে। গরিবদের কেনার সামর্থ্য থাকে না; ফলে গরিব গৃহিণীকে সব অবমাননা সহ্য করতে হয়। শ্রমিক নারীর ক্ষেত্রে তার সন্তান বড় হয়

রাস্তায় অথবা গ্রামে কোনো আত্মীয়ের বাসায়। মধ্যবিত্ত নারীকেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার পরিবার বা কর্মক্ষেত্র যে কোনো একটিকে বেছে নিতে হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন দেখিয়েছিল সমাজতন্ত্রে শিশুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব রাষ্ট্রের; তারা পরিবারের গৃহস্থালির কাজকে (যার দায়িত্ব অধিকাংশ সময় নারীকেই নিতে হয়) সামাজিক কাজে রূপান্তরিত করেছিল এবং নারীকে তার নিজস্ব শ্রম, কাজ ও মেধার উপর নির্ভর করার পরিবেশ তৈরি করেছিল।

আজ পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে পারিবারিক ব্যবস্থা যেন শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হয়েছে; সামাজিক পারিবারিক সম্পর্কগুলো স্বার্থ-মুনাফা, লোভ-লাভ-মোহ-আত্মকেন্দ্রিকতার কাছে মুখ থুবড়ে পড়ছে। ভালোবাসা প্রকাশের বিভিন্ন দিবস ও উপলক্ষ্য বানিয়ে ব্যাবসা হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃতভাবে ভালো আর বাসা যাচ্ছে না। ফলে যেভাবে এঙ্গেলস বলেছিলেন, বৈষম্য যতদিন থাকবে ততদিন পুরুষের অর্থ, সম্পত্তির মালিকানা ও ক্ষমতার বিভিন্ন অবস্থানের কাছে নারীর ভালোবাসা জিম্মি হয়ে যাবে। একমাত্র সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানাহীন সমাজেই নারী তার প্রকৃত ভালোবাসার মানুষের সাথে বিনা বাধায় মিলিত হতে পারবে; পুঁজিবাদী সমাজে অর্থাৎ ব্যক্তিগত মালিকানার সর্বোচ্চ স্তরে তাই আমরা ঠিক এর উল্টোটাই দেখতে পাবো—এটাই স্বাভাবিক। এমনকি পরিবারের সবচেয়ে মহিমান্বিত সম্পর্ক মা-সন্তানের সম্পর্কও ভেঙে পড়েছে। বৃদ্ধা মাকে বোঝা মনে হচ্ছে সন্তানের কাছে। পুঁজিবাদের যাতাকলে অনেক সময় শ্রমিক বা দরিদ্র মা সন্তান গর্ভে আসলে ঠিক ততটা খুশি হতে পারছেন না। এমনকি পুঁজিবাদ মাতৃগর্ভ ভাড়া দেওয়ার ব্যাবসাও চালু করেছে।

এমন সময়ে সারাবিশ্বে ব্যাপকভাবে নারীমুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠা প্রয়োজন। তবে বর্তমান পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়া নারীমুক্তি আন্দোলনকে সমাজবিকাশের আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্নভাবে উপস্থাপন করে। সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্যের সাথে নারীর প্রতি বৈষম্যও যে যুক্ত তা আড়াল করতে চায় এবং শেষ পর্যন্ত এ এক পুরুষ বিদ্বেষী আন্দোলনে রূপ নেয়। তাতে বৈষম্য বা নির্যাতন এক বিন্দুও কমে না এবং সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বোপরি সমাজ কাঠামোকে বিচ্ছিন্ন রেখে নারী, পুরুষকেই নির্যাতন ও বৈষম্যের একমাত্র কারণ বলে মনে করতে থাকে।

নারীমুক্তি আন্দোলন যে মানবমুক্তিরও আন্দোলন সেকথা বেগম রোকেয়া কত সরলভাবে বলেছিলেন, 'আমরা (নারীরা) সমাজেরই অর্দ্ধঅঙ্গ। আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কীরূপে? কোনো ব্যক্তির এক পা

বাঁধিয়া রাখিলে, সে খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে—একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা আমাদেরও লক্ষ্য তাহাই।'[১] তাই যে সমাজ নারীকে মানুষ হিসেবে মর্যাদা দেয় না, নিরাপত্তা দেয় না, মূল্যায়ন করে না—সেই সমাজ কোনো মানবিক সমাজ নয়। সেই অমানবিক-পচা-গলা সমাজকে পাল্টাতে হবে; গড়ে তুলতে হবে নতুন মানবিক সমাজ।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায় লিখেছিলেন—'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।' মাও সেতুং নারীকে 'অর্ধেক আকাশ' এর সাথে তুলনা করেছিলেন। সেই অর্ধেক পৃথিবীর স্রষ্টা অর্ধেক আকাশ আজ মেঘাচ্ছন্ন। সেই মেঘ দূর করতে পুঁজিবাদী শোষণের অবসান ঘটাতে হবে। এই পুঁজিবাদ আজকে অনাহার, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, বেকারত্ব আর অনিশ্চিত জীবন ছাড়া কিছুই দেয় না। সেখানে নারীমুক্তি তো দূরের কথা! যতদিন পুঁজিবাদ টিকে থাকবে ততদিন নারীকে নিয়ে ব্যাবসাও টিকে থাকবে। আর নারীমুক্তির লক্ষ্যে সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যারা কাজ করবে 'রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' তাদের সামনে বড় শিক্ষা হিসেবে থাকবে। আজকের দিনের নারীমুক্তি আন্দোলনের পতাকা সঠিক পথে সঠিক হাতে তুলে ধরতে হবে শ্রমজীবী সর্বহারা শ্রেণির সংগঠনকেই। ইতিহাস বলে, আগামী দিন হবে সর্বহারা শ্রেণি জনতার এবং সাথে সাথে সর্বহারা নারীর।

১. স্ত্রীজাতির অবনতি—বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

নারীদের প্রশ্নে লেনিন

ক্লারা জেটকিন

কমরেড লেনিন আমার সঙ্গে নারীদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য কমিউনিজম-এর কথা বলতে গেলে নারীদের সামাজিক সমান অধিকার যে একটা প্রয়োজনীয় নীতি তা বলাই বাহুল্য। ১৯২০ সালের শরৎকালে ক্রেমলিনে লেনিনের পড়ার ঘরে বসেই সর্বপ্রথম আমাদের এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। লেনিন শুরু করলেন—'সুস্পষ্ট মতবাদের ভিত্তিতে আমাদের একটি শক্তিশালী আন্তর্জাতিক নারী আন্দোলন গড়ে তুলতেই হবে। এ কথা স্পষ্ট যে, মার্কসীয় মতবাদ ছাড়া কোনো সুষ্ঠু বাস্তব কাজ সম্ভব নয়। এই প্রশ্নের উপর আমাদের, কমিউনিস্টদের নীতি সম্পর্কে সবচেয়ে সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন। আমাদের নিজেদের এবং অন্য সমস্ত পার্টির মধ্যে পরিষ্কার পার্থক্য থাকবেই। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দ্বিতীয় আর্ন্তজাতিক কংগ্রেসে এ বিষয়ে আলোচনা হয়নি। এ প্রসঙ্গ উঠেছিল বটে কিন্তু কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি এখনও কমিশনের হাতে আছে। তাঁদেরই এর উপর একটি প্রস্তাব লিখে ব্যাখ্যামূলক আলোচনা করে নির্দেশ দিতে হবে। যাই হোক, এখনও পর্যন্ত এই কমিশনের কাজ বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। এ বিষয়ে তোমাদের সাহায্য করতে হবে।'

লেনিন যা বললেন, সে বিষয়ে আমি আগেই অবগত ছিলাম এবং অবস্থাটা দেখে বিস্ময় প্রকাশও করেছিলাম। বিপ্লবের সময় রাশিয়ার নারীরা

যা করেছেন এবং এখনও তাঁরা দেশ রক্ষার ও দেশের উন্নতির জন্য যা করছেন তা দেখে আমি উৎসাহে উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিলাম, আর বলশেভিক পার্টির মধ্যে নারী কমরেডদের স্থান ও তাঁদের কাজকর্ম দেখে আমার মনে হয়েছিল—এ এক আদর্শ পার্টি। শুধু এটিই একটি প্রয়োজনীয় সুদক্ষ ও অভিজ্ঞ শক্তিশালী আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনে পরিণত হয়েছে, যা কিনা একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তবিশেষ।

শ্রমজীবী নারী আন্দোলন

'ঠিক ঠিক, খুব সত্যি কথা, চমৎকার কথা,' স্মিত হেসে লেনিন বললেন। 'পেত্রোগ্রাডে, এই মস্কোতে, অন্যান্য শহরে ও শিল্পাঞ্চলে নারী শ্রমিকরা বিপ্লবের সময় অদ্ভুত কাজ করেছেন, তাদের ছাড়া আমরা বিজয়ী হতেই পারতাম না বা আমাদের জয় প্রায় অসম্ভব হতো। এই আমার মত। তাঁরা যে কত বীরত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং এখনও দিচ্ছেন ভেবে দেখ, কত কষ্ট, কত বঞ্চনা সহ্য করেছেন তাঁরা। আর এখনও যে তারা করতে পারছেন তার কারণ তাঁরা চান স্বাধীনতা, তারা চান কমিউনিজম। হ্যাঁ, আমাদের সর্বহারা নারীরা চমৎকার শ্রেণি-সংগ্রামী। তাঁরা প্রশংসা ও ভালোবাসার যোগ্য। তাছাড়া একথাও মনে রেখো যে এমনকি পেত্রোগ্রাডে 'কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্র্যাসি' দলের ভদ্রমহিলারাও পর্যন্ত আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ঐ জাঙ্কারদের চেয়ে বেশি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এ কথা সত্য। আমাদের পার্টিতে আছেন বিশ্বাসী, যোগ্য এবং অক্লান্ত পরিশ্রমী নারী কমরেডরা। আমরা তাঁদের সোভিয়েত, এক্সিকিউটিভ কমিটিতে, পিপল্‌স্ কমিসারিয়েতে এবং সর্বরকম নাগরিক প্রতিষ্ঠানের বিশিষ্ট পদে নিয়োগ করতে পারি। তাঁদের মধ্যে আনেকেই পার্টিতে, সর্বহারা জনসাধারণের মধ্যে, কৃষকদের মধ্যে ও লালফৌজের মধ্যে দিন-রাত কাজ করে থাকেন। আমাদের কাছে এর মূল্য অনেক। পৃথিবীর সমস্ত নারীর কাছেও এর মূল্য আছে। এতে নারীদের যোগ্যতার প্রকাশ পায়। সমাজে তাঁদের কাজের যে কতটা মূল্য আছে তা প্রমাণ হয়। মেয়েদের সামাজিক সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রথম সর্বহারা একনায়কত্ব সত্যই পথপ্রদর্শক। একনায়কত্ব যত বেশি কুসংস্কার দূর করেছে, তা স্ত্রীজাতির অধিকারের বিষয়ে লেখা গাদা গাদা সাহিত্যও করতে পারত না। কিন্তু এসব কিছু সত্ত্বেও এখনও আমাদের কোনো আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নারী আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। এই জিনিসটির বিশেষ প্রয়োজন। এখনই এ কাজ শুরু করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের ইন্টারন্যাশনালের কাজ ও তার পার্টিগুলোর কাজ কখনই সম্পূর্ণ হবে না, হতে পারে না। আমাদের

বিপ্লবের কাজ সম্পূর্ণ করে তুলতেই হবে। বিদেশে কমিউনিস্টদের কাজ কেমন হচ্ছে বলো?'

সামনের দিকে সামান্য একটু হেলে বসে লেনিন এক মনে সব শুনলেন। এমনকি ছোট ছোট ঘটনাগুলো পর্যন্ত শুনতে লাগলেন। বিরক্তি, অধৈর্য বা ক্লান্তির কোনো চিহ্নই নেই।

'মন্দ নয়, মোটেই মন্দ নয়,' লেনিন বললেন। 'নারী কমরেডদের শক্তি কাজের ইচ্ছা, উদ্দীপনা—বেআইনি বা আধাআইনি সময়ে তাঁরা যে সাহস ও বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন তা থেকেই বোঝা যায় যে, আমাদের অগ্রগতির ভবিষ্যৎ খুবই ভালো। পার্টির প্রসারের দিক থেকে, পার্টির শক্তিবৃদ্ধির দিক থেকে, জনসাধারণকে জয় করার ও আমাদের কাজকর্ম চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার দিক থেকে তাঁরা খুবই মূল্যবান শক্তি। কিন্তু এই সব পুরুষ ও নারী কমরেডদের শিক্ষা দেওয়ার ও তাদের কর্মনীতি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেওয়ার বিষয়টার কী হলো? জনসাধারণের মধ্যে কাজ করতে হলে এ বিষয়টার মৌলিক গুরুত্ব আছে। জনসাধারণকে জয় করতে হলে, তাদের উৎসাহিত করতে হলে এ জিনিসটির প্রভাব প্রভূত। কথায় বলে—মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে চাই উদ্দীপনা। আমাদের এবং সারা দুনিয়ার শ্রমজীবী মানুষকে সত্যিই মহৎ কাজ সম্পন্ন করতে হবে।...

সংগঠনের নীতি

ঘড়ির দিকে এক পলক তাকিয়ে লেনিন বললেন—'তোমার জন্য যতটা সময় দেবো ভেবেছিলাম ইতিমধ্যেই তার অর্ধেক কেটে গেল, আমি বকেই চলেছি। নারীদের মধ্যে কমিউনিস্টদের কাজের প্রোগ্রাম তোমাকে ঠিক করতে হবে। চটপট বলো, তুমি কী ধরনের প্রোগ্রাম ভেবেছো?

আমি সংক্ষেপে সে কথা বললাম। লেনিন বাধা না দিয়ে বারে বারে মাথা নাড়লেন। আমার কথা শেষ হলে প্রশ্নসূচকভাবে তাঁর দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, 'ঠিক। আমি শুধু কয়েকটি প্রধান প্রধান বিষয়ে বলতে চাই—যে বিষয়ে তোমার মতের সঙ্গে আমার মিল আছে। আমার মনে হয় সেগুলো আমাদের বর্তমান প্রচার ও আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, যদি তা কাজে ও সফল সংগ্রামে পরিণত হয়।

'বক্তব্যের বিষয় থেকে এ কথা পরিষ্কার হওয়া চাই যে, নারীদের প্রকৃত স্বাধীনতা কেবলমাত্র কমিউনিজম এর মাধ্যমেই আসতে পারে। নারীদের

সামাজিক ও মানবিক অবস্থা আর উৎপাদনের উপায়ের উপর ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সে কথা দৃঢ়ভাবে তুলে ধরতে হবেই। তার থেকেই আমাদের নীতি আর নারীবাদ (ফেমিনিজম) এর মধ্যে স্পষ্ট ও মৌলিক পার্থক্য বোঝা যাবে এবং এর দ্বারা নারীদের প্রশ্নকে সামাজিক প্রশ্নের শ্রমিক সমস্যার অংশ হিসেবেই বুঝার ভিত্তি যোগাবে। সুতরাং এই প্রশ্নকে সর্বহারা শ্রেণি সংগ্রাম ও বিপ্লবের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে জড়াতে হবে। কমিউনিস্ট নারীদের আন্দোলনটাই একটা গণআন্দোলন, সাধারণ গণআন্দোলনের অংশ হতেই হবে। শুধু সর্বহারাদের নয়, সমস্ত শোষিত ও সর্বহারা শ্রেণি সংগ্রামের তাৎপর্য এবং তার ঐতিহাসিক সৃষ্টি—কমিউনিস্ট সমাজ। আমরা প্রকৃতই গর্বের সঙ্গে এ কথা বলতে পারি যে আমাদের পার্টিতে, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে রয়েছে বিপ্লবী নারীজাতির ফুলগুলো। কিন্তু সে কথাই যথেষ্ট নয়। গ্রাম ও শহরের হাজার হাজার শ্রমজীবী নারীদের আমাদের দিকে জয় করে আনতেই হবে। তাদের জয় করে আনতে হবে আমাদের সংগ্রামের জন্য এবং বিশেষত কমিউনিজম এর দিকে, সমাজের রূপান্তরের জন্য। নারীদের ছাড়া কোনো সত্যিকারের গণআন্দোলনই হতে পারে না।'

'আমাদের তত্ত্বগত বোধ থেকেই সংগঠনের নীতিগুলো উদ্ভূত হয়। নারীদের জন্য বিশেষ সংগঠন নয়, ঠিক একজন পুরুষের মতোই একজন নারী কমিউনিস্ট পার্টির একজন সভ্য। তার সমান অধিকার, সমান কর্তব্য। তবুও এদিকে আমাদের চোখ বন্ধ করে থাকলে চলবে না যে, সাধারণ শ্রমিক নারীদের উদ্বুদ্ধ করার, তাদের পার্টির সঙ্গে যুক্ত করার, তাদের পার্টির প্রভাবে রাখার বিশেষ দায়িত্ব পালনের জন্য সংগঠন, কর্মী গ্রুপ, কমিশন, ব্যুরো বা যা বলো, রাখতেই হবে। এ অবশ্য তাদের মধ্যে নিয়মিত কাজের জন্যই প্রয়োজন। আমরা যাদের উদ্বুদ্ধ করি ও জয় করি, তাদের শিক্ষিত করে তুলতেই হবে। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে শ্রেণি সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত করে তুলতেই হবে। আমি শুধু সর্বহারা নারীদের কথাই ভাবছি না—কারখানাতেই কাজ করুক, আর বাড়িতেই কাজ করুক, সব নারীদের কথাই ভাবছি। গরিব কৃষক রমণী, মধ্যবিত্ত নারী—তারাও ধনতন্ত্রের শিকার এবং যুদ্ধের পর থেকে এর কথা আরও বেশি করে বলা যায়। এসব নারীদের অরাজনৈতিক অসামাজিক পশ্চাদপদ মানসিক অবস্থা তাদের কর্মক্ষেত্রের বিচ্ছিন্ন পরিধি, তাদের জীবনের সমগ্র ধরন-ধারণ—এ সবই বাস্তব। সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব—একেবারেই অসম্ভব। তাদের মধ্যে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন উপযোগী সংগঠন, বিশিষ্ট প্রচার পদ্ধতি

এবং সংগঠনের ধরন, তার নাম নারীবাদ (ফেমিনিজম) নয়।—এ হলো কার্যকরী বাস্তব, বৈপ্লবিক প্রয়োজন।'

আমি লেনিনকে বললাম যে, তাঁর কথা আমাকে প্রভূত উৎসাহ দিয়েছে। অনেক কমরেড, ভালো ভালো কমরেড পর্যন্ত জোরের সঙ্গে আপত্তি করে বলেছেন যে, নারীদের মধ্যে নিয়মিত কাজের জন্য আলাদা সংগঠন থাকা উচিত নয়।

'এ কোনো নতুন কথাও নয়, আর এর থেকে কিছু প্রমাণও হয় না,' লেনিন বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই এর দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছ। আমাদের পার্টিতে নারীদের সংখ্যা কখনও পুরুষদের মতো হয়নি কেন—সোভিয়েত রাশিয়াতে কখনও হয়নি কেন? ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে সংগঠিত নারী শ্রমিকদের সংখ্যা এত কম কেন? এই সব ঘটনাই আমাদের চিন্তার খোরাক যোগাবে। সাধারণ নারীদের মধ্যে কাজের জন্য আলাদা সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা বাতিল করার চিন্তাটা আমাদের কমিউনিস্ট লেবার পার্টির অতিরিক্ত আদর্শনিষ্ঠ ও উগ্র বন্ধুদের ধারণার মতোই। তাদের মতে সংগঠনের রূপ থাকবে একটিই—শ্রমিক ইউনিয়ন। আমি তাদের জানি। যখনই চিন্তার দৈন্য দেখা দেয় অনেক বিভ্রান্তমনা বিপ্লবী নীতির দোহাই পাড়ে। ঘটনাগুলোর প্রতি মনের দরজা বন্ধ থাকে তখন এই অবস্থা হয়। এই সব 'পবিত্র নীতির' অভিভাবকরা তাদের ধারণার সঙ্গে আমাদের উপর ঐতিহাসিকভাবে যে বৈপ্লবিক নীতি ন্যস্ত হয়েছে তার সামঞ্জস্য করে কীভাবে? কঠিন অনিবার্য প্রয়োজনের সময় এই ধরনের সব কথাবার্তার কোনো দামই থাকে না। যতক্ষণ না হাজার হাজার নারী আমাদের সঙ্গে আসছে আমরা সর্বহারা একনায়কত্ব কার্যকরী করে তুলতে পারি না, কমিউনিজম-এর লাইনে গঠনকার্য করতে পারি না। তাদের মধ্যে যাওয়ার পথ বের করতেই হবে। সে পথ বের করার জন্য আমাদের অধ্যয়ন করতেই হবে, চেষ্টা করতেই হবে।'

এই মুহূর্তের দাবি

'সেই জন্য নারীদের উপযোগী দাবিগুলো তুলে ধরা আমাদের কর্তব্য। সেকেন্ড ইন্টারন্যাশনালের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের মতানুযায়ী এটা একটা সংস্কারমূলক প্রোগ্রাম নয়, এটা একটা ন্যূনতম কর্মসূচি নয়। নারীদের দাবিতে কথা বললে এ কথা বোঝায় না যে, বুর্জোয়া শাসন ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র চিরস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী হবে বলে বিশ্বাস করি। সংস্কারমূলক কাজ দ্বারা নারীদের তোষণ করা বা তাদের বিপ্লবী সংগ্রাম থেকে সরিয়ে নেওয়াও বোঝায় না। তাও নয়,

আবার অন্য কোনো রকম সংস্কারবাদী প্রতারণাও নয়। আমাদের দাবিগুলো বাস্তব সিদ্ধান্ত। এগুলো জ্বলন্ত প্রয়োজন থেকে বুর্জোয়া সমাজে নারীদের অবমাননা থেকে, তাদের অসহায়, অধিকারহীন অবস্থা থেকে উদ্ভূত। এর দ্বারা আমরা দেখাচ্ছি যে, আমরা এই দাবিগুলি স্বীকার করি এবং নারীদের অবমাননা ও পুরুষের সুবিধা সম্বন্ধে সচেতন। আমরা ঘৃণা করি—হ্যাঁ, যা কিছু নারী শ্রমিকদের, গৃহিণীদের, কৃষক রমণীদের, ছোট ব্যবসায়ীদের স্ত্রীদের এবং অনেক ক্ষেত্রে সম্পন্ন শ্রেণির নারীদের নির্যাতন এবং শোষণ করে সে সব জিনিসকেই আমরা ঘৃণা করি এবং বর্জন করব। বুর্জোয়া সমাজের কাছ থেকে আমরা নারীদের জন্য যে অধিকারগুলো ও সামাজিক আইনের দাবি করি, তা থেকেই বোঝা যায় যে আমরা নারীদের অবস্থা ও স্বার্থ বুঝি এবং সর্বহারা একনায়কত্বের সময় আমরা সেগুলো বিবেচনা করব। অবশ্য সংস্কারবাদীদের মতো তাদের কর্মদক্ষতা শিথিল করে দেবো না। তাদের একঘেয়ে কাজের মধ্যে আটকে রাখব না। না, কখনোই না। আমরা বিপ্লবীদের মতো নারীদের আহ্বান জানাব সমানভাবে পুরোনো অর্থনীতি ও ভাবধারার বিবর্তন সাধন করতে।'

আমি লেনিনকে বললাম যে, তাঁর মতের সঙ্গে আমার মিল আছে। কিন্তু বাধা নিশ্চয়ই আসবে। এ কথাও অস্বীকার করা যায় না যে নারীদের আশু দাবিগুলো ভুলভাবেও তৈরি ও প্রকাশ করা হয়ে যেতে পারে।

'বাজে কথা,' লেনিন প্রায় রাগতভাবেই বলে উঠলেন, 'সে বিপদ আমরা যা কিছু করি বা বলি তার সব কিছুতেই আছে। আমরা যদি এই ভয়ে যা ঠিক ও প্রয়োজন তা করতে নিরস্ত হই, তবে আমরা হয়তো চূড়ায় উপবিষ্ট ভারতীয় যোগীতে পরিণত হবো। কোনো কাজকর্মের দরকার নেই, উঁচু স্তম্ভের মাথায় বসে শুধু নীতি ও আদর্শ নিয়ে চিন্তা করো। ঠিকই, আমাদের শুধু দাবিগুলোর বিষয়বস্তুর কথা ভাবলেই চলবে না, সেগুলো কীভাবে উপস্থিত করা হবে তাও দেখতে হবে। আমি ভেবেছিলাম যে, সে কথা আমি যথেষ্ট পরিষ্কার করে বলেছি। অবশ্য যান্ত্রিকভাবে মালা জপ করার মতো করে আমাদের দাবিগুলি বলে গেলেই হবে না। না, বর্তমান পরিস্থিতি অনুযায়ী যখন যেটা সম্ভব তখন সেই দাবির জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং সর্বহারা সাধারণের স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে কাজ করতে হবে।'

এই রকম প্রতিটি সংগ্রাম সম্মানিত বুর্জোয়া সম্পর্কের বিরুদ্ধে আমাদের দাঁড় করায়, আর আমাদের নিয়ে আসে এই সম্পর্কের সমর্থক সংস্কারবাদী (এদের সম্মানও কম নয়) মোসাহেবদের বিরুদ্ধে। এই সংগ্রাম আমাদের সঙ্গে

সঙ্গে আমাদের নেতৃত্বে তাদের লড়াই করতে বাধ্য করে—যা তারা করতে চায় না অথবা এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের প্রকৃত চেহারাগুলো ফুটে বেরোয়। অর্থাৎ সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আমাদের সঙ্গে অন্য পার্টিদের তফাত পরিষ্কার হয়ে যায়, আমাদের কমিউনিজম স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে আমরা সেইসব সাধারণ নারীদের বিশ্বাস অর্জন করতে পারি—যারা পুরুষের কর্তৃত্ব দ্বারা, মালিকের ক্ষমতার দ্বারা, সমগ্র বুর্জোয়া সমাজের দ্বারা শোষিত, দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, নির্যাতিত হয়ে থাকে। সবার কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা পেয়ে ও সবার দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে শ্রমজীবী নারীরা বুঝতে পারবে যে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংগ্রাম করতেই হবে।

'আমায় কি আবার শপথ করে বলতে হবে অথবা তোমাকেই শপথ করে বলতে হবে যে, নারীদের দাবির জন্য আমাদের যে সংগ্রাম, তা ক্ষমতা দখলের সঙ্গে সর্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে জড়িত করতেই হবে। বর্তমানে এই আমাদের সব কথা। একথা স্পষ্ট, খুবই স্পষ্ট। রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের দাবি—এই একটা মাত্র দাবিই সর্বদা তুলে ধরলে এর সংগ্রামে শ্রমজীবী নারী কিন্তু অনিবার্যভাবে অংশগ্রহণ করার প্রেরণা পাবে না, তা সে দাবি যত করেই প্রচার করা হোক না কেন। না, না, তা নয়—আমাদের দাবির সঙ্গে তাদের নিজেদের দুঃখ কষ্টের প্রয়োজনের এবং আকাঙ্ক্ষার যে রাজনৈতিক সম্বন্ধ আছে, সে সম্পর্কে তাদের সচেতন করে তুলতে হবে। তাদের বুঝা দরকার যে সর্বহারা একনায়কত্বের অর্থ তাদের কাছে কি পুরুষের সঙ্গে আইনের চোখে, বাস্তব ক্ষেত্রে, পরিবার, রাষ্ট্রে, সমাজে সম্পূর্ণ সমান অধিকার, বুর্জোয়া ক্ষমতার সমান।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'সোভিয়েত রাশিয়াই তা দেখিয়ে দিচ্ছে।'

'আমাদের শিক্ষার মধ্যে এ এক মস্ত বড় উদাহরণ হবে' লেনিন বলে চললেন, 'সোভিয়েত রাশিয়া নারীদের জন্য আমাদের দাবিগুলোকে নতুন আলোকে তুলে ধরে। সর্বহারা একনায়কত্বে সে দাবিগুলো সর্বহারা এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে সংগ্রামের বিষয়বস্তু নয়। তারা কমিউনিস্ট সমাজের কাঠামোর অংশ এ দ্বারা অন্য দেশের নারীজাতির কাছে সর্বহারার ক্ষমতা দখলের চূড়ান্ত গুরুত্ব সূচিত হয়। এই পার্থক্যটা বিশেষ জোর দিয়ে বলা দরকার যাতে নারীরা সর্বহারা বিপ্লবী শ্রেণি সংগ্রামে যোগ দেয়। কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর পক্ষে এবং তাদের জয়ের জন্য তাদের নীতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা ও দৃঢ় সংগঠনের ভিত্তিতে তাদের সমবেত করা একান্তই প্রয়োজন, কিন্তু আমরা যেন নিজেদের প্রতারণা না করি। আমাদের জাতীয় অংশগুলোর

মধ্যে এখনও পর্যন্ত এ বিষয়ে সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। যখন কমিউনিস্ট নেতৃত্বে শ্রমজীবী নারীদের গণআন্দোলনের সৃষ্টি করার কাজ পড়ে রয়েছে, তখন তারা আলস্যে সময় কাটিয়ে দিচ্ছে। তারা বুঝতে পারে না যে, এইরকম একটা গণআন্দোলন গড়ে তোলা ও তার ব্যবস্থা করা সমগ্র পার্টির কাজেরই একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ, বাস্তবিকই, পার্টির সাধারণ কাজের অর্ধেক। একটি শক্তিশালী স্বচ্ছ কমিউনিস্ট নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ও তার মূল্য সম্বন্ধে তাদের সাময়িক স্বীকৃতি কেবলমাত্র নিস্পৃহ ও মৌখিক স্বীকৃতি, এর প্রতি সদা সর্বদা তাদের দৃষ্টি ও দায়িত্ববোধ নেই।'

আর পুরুষরা?

'নারীদের মধ্যে প্রচার আন্দোলনের কাজকে তাদের জাগ্রত ও বিপ্লবী করে তোলার কাজকে যেন প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মতো ধরা হয়। এটা যেন কেবলমাত্র নারী কমরেডদেরই ব্যাপার। এদিকে কাজ আরও তাড়াতাড়ি আরও জোরের সঙ্গে এগোচ্ছে না বলে শুধুমাত্র তাদেরই ভর্ৎসনা করা হয়। ভুল, খুবই ভুল। আসলে স্বাতন্ত্র্যবাদ। ফরাসিরা যাকে বলে উল্টোধারা-নারীবাদ। আমাদের জাতীয় অংশের ভুল দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি কী? চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে, তা নারীদের ও তাদের কাজকে ছোট করে দেখা ছাড়া আর কিছুই নয়। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! দুর্ভাগ্যবশত আমাদের অনেক কমরেডের বিষয়েই একথা বললে সত্য হবে যে, 'একজন কমিউনিস্ট-এর গায়ে নখের আঁচড় দিয়ে দেখ, তার সংকীর্ণমনা চেহারা বেরিয়ে পড়বে। অবশ্য নরম জায়গায় আঁচড়ে দেখতে হবে—নারীদের বিষয়ে তাদের মনোভাব কী। কেমন করে নারীরা ক্ষুদ্র একঘেয়ে ঘরকন্নার কাজে জরাজীর্ণ হয়ে যায়, তাদের শক্তি ও সময় বিক্ষিপ্ত ও বিনষ্ট হয়, তাদের মন সংকীর্ণ ও বিস্বাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাদের নিঃশ্বাস মন্থর হয়ে আসে, ইচ্ছাশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে তা দেখেও পুরুষরা নারীদের নীরব আত্মদান ভোগ করে আসছে। এর চেয়ে সংকীর্ণ মনের বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে? অবশ্য আমি সব বুর্জোয়া মহিলাদের কথা বলছি না, যারা চাকরদের উপর ঘরকন্নার সব দায়িত্ব ঠেলে দেয়—এমন কি ছেলেপিলেদের দেখাশোনা করার দায়িত্বও। আমি যা বলছি তা বেশির ভাগ নারীদের পক্ষে খাটে, শ্রমিকদের স্ত্রীদের পক্ষে এবং যারা সারাদিন কারখানায় খাটে, তাদের পক্ষেও খাটে।'

'সুতরাং অতি অল্প লোকই—এমনকি সর্বহারাদের মধ্যেও খুব কম লোকই বোঝে যে, যদি তারা 'মেয়েদের কাজে' একটু সাহায্য করে তবে কতটা কষ্ট কমাতে, এমনকি অনেকটা দূর করতেও পারে। কিন্তু না, তা হলো

'পুরুষের অধিকার ও মর্যাদার' প্রতিকূল! তারা তাদের শান্তি ও আরাম চায়। নারীর ঘরোয়া জীবন হলো হাজার রকমের ছোট ছোট বিষয় দিয়ে প্রতিদিনের আত্মত্যাগ। পুরুষের আগেকার প্রভুত্বের অধিকার এখনও গোপনে গোপনে বেঁচে আছে। তার দাসীও গোপনে প্রতিশোধ নেয়। নারীদের পশ্চাৎপদতার দরুন, পুরুষের বৈপ্লবিক আদর্শের কথা তাদের না বোঝানোর দরুন পুরুষের আনন্দ কমে যায় ও সংগ্রামের দৃঢ়তা শিথিল হয়ে আসে। তারা ক্ষুদ্র কীটের মতো অলক্ষ্যে, ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে পচন ধরায় ও ক্রমশ ক্ষয় করে। আমি শ্রমিকদের জীবন জানি এবং কেবলমাত্র বই থেকেই নয়। নারীদের মধ্যে আমাদের কমিউনিস্টদের কাজ, আমাদের রাজনৈতিক কাজ, পুরুষের মধ্যেও অনেক শিক্ষামূলক কাজ পর্যন্ত বিস্তৃত। পুরোনো 'প্রভুত্বের' ধারণা শেষ পর্যন্ত, তার ক্ষুদ্রতম জড় পর্যন্ত নির্মূল করতেই হবে—পার্টির মধ্যে এবং জনগণের মধ্যে থেকে। যেমন শ্রমজীবী নারীদের মধ্যে পার্টির কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য, নীতি ও কাজের দিক থেকে সুশিক্ষিত পুরুষ ও নারী কমরেডদের কর্মীদল গঠন করার কাজটা জরুরি, এটাও ঠিক তেমনই আমাদের অন্যতম রাজনৈতিক কাজ।'

নতুন জীবন গঠনে অযুত মানুষ

এ বিষয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থা সম্বন্ধে আমার প্রশ্নের উত্তরে লেনিন বললেন, 'অবশ্য, পুরুষ ও নারীর মধ্যে পশ্চাৎপদ ধারণা দূর করতে পুরাতন অকমিউনিস্ট মানসিকতার ধ্বংস করার চেষ্টার দিক থেকে সর্বহারা একনায়কত্বের সরকার কমিউনিস্ট পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে মিলিত হয়ে যথাসাধ্য করছে। আইনের দিক থেকে স্বভাবতই পুরুষ ও নারীর সমান অধিকার রয়েছে এবং সর্বত্রই এই সমান অধিকার কার্যে পরিণত করার জন্য আন্তরিক ইচ্ছার প্রমাণ দেখা যায়। আমরা নারীদের সামাজিক অর্থনীতির মধ্যে আইন প্রণয়ন ও রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের মধ্যে নিয়ে আসছি। সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দ্বার তাদের কাছে উন্মুক্ত—যাতে তারা তাদের জীবিকা অর্জনের যোগ্যতা, সামাজিক যোগ্যতা বৃদ্ধি করতে পারে। আমরা সাধারণ রান্নাঘর, যৌথ রন্ধনশালা ও আহার গৃহ, ধোপাখানা ও মেরামতের দোকান, শিশু বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, শিশু প্রতিষ্ঠান ও সমস্ত রকমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করছি। সংক্ষেপে, আলাদা আলাদা ঘরকন্নার অর্থনৈতিক ও শিক্ষামূলক কাজকর্মগুলোকে সামাজিক দায়িত্বে পরিণত করার প্রোগ্রাম আমরা গুরুত্বের সঙ্গে কাজে পরিণত করছি। তার অর্থ দাঁড়াবে সাবেকি ঘরকন্নার একঘেয়েমি থেকে ও পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা থেকে নারীদের মুক্তিলাভ। তার দ্বারা

নারীরা সম্পূর্ণরূপে তাদের প্রতিভা, ক্ষমতা ও আগ্রহ কাজে ব্যবহার করতে সমর্থ হবে। শিশুরাও বাড়ি অপেক্ষা অনেক ভালো অবস্থায় মানুষ হচ্ছে। আমাদের নারী শ্রমিকদের জন্য যে রক্ষণমূলক আইন আছে তা পৃথিবীর অন্য সব দেশের আইনের চেয়ে বেশি অগ্রগামী এবং সংগঠিত শ্রমিকরা সরকারি কর্মচারীরা সেগুলো কার্যকরী করে। আমরা প্রসূতি হাসপাতাল খুলছি, মা ও শিশুদের জন্য প্রতিষ্ঠান খুলছি, মাতৃ শিক্ষাসদন খুলছি, শিশুপালন সম্বন্ধে বক্তৃতার ব্যবস্থা করছি, মা ও শিশুদের যত্ন কী করে নিতে হয় সে সম্বন্ধে প্রদর্শনী এবং এই রকম অনেক কিছুর ব্যবস্থা করছি। বেকার এবং সংস্থানহীন নারীদের ভরণপোষণের জন্য আমরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে চেষ্টা করছি।'

'আমরা এ কথা পরিষ্কার বুঝতে পারি যে শ্রমজীবী নারীদের প্রয়োজনের তুলনায় এ সব কিছুও যথেষ্ট নয়—তাদের প্রকৃত স্বাধীনতার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তার থেকে এ অনেক অনেক কম। কিন্তু তবুও যে সব দেশে জার ধনতন্ত্রের অবাধ শাসন চলছে, সে সব দেশের তুলনায় এ অনেকখানি বেশি। সঠিক দিকে আমাদের শুভ সূচনা হয়েছে এবং আমরা আরও অনেক উন্নতি করব। বিশ্বাস করো, আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে তা করব। সোভিয়েত রাষ্ট্রের অস্তিত্বের প্রতিটি দিনই বেশি করে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করছে যে, নারীদের ছাড়া আমাদের অগ্রগতি অসম্ভব।'

[এই লেখাটি কনক মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'নারীমুক্তির প্রশ্নে—মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্তালিন' বই থেকে সংগৃহীত]



সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম
কেন্দ্রীয় কমিটি
২৩/২ তোপখানা রোড (৩য় তলা), ঢাকা-১০০০, ফোন : ৯৫৮২২০৬, ০১৭১৬ ৫৭৫২৭৭
ফ্যাক্স : ৯৫৫৪৭৭২, ই-মেইল : swfcc.bd@gmail.com
মূল্য : ৫০ টাকা